মনের অস্থিরতা, আপনার হাতে শান্তি

জেলর

ঃ লেখক ঃ

পূজ্য আচার্যদেব

শ্রী বিজয় প্রেম-ভুবনভানু-জয়ঘোষ-ধর্মজিৎ-জয়শেখরসুরিজী-র শিষ্য

জৈনাচার্য বিজয় অভয়শেখরসুরি

ঃ প্রকাশক ঃ

ভুবনে ধর্মজয়কর প্রকাশন

শ্রী গিরিশভাই বড়েচা

১০১, সমিত শেখর অ্যাপার্টমেন্ট, কাজী ময়দান, গোপীপুরা

সুরাত-৩৯৫০০১, ফোন ঃ ০২৬১-২৫৯৯৩৪৭

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

মহেশ শাহ

আসাম বেঙ্গল মিল স্টোর্স কো.

১৬/২এ, আর্মেনিয়ান স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০ ০০১

ফোন - ৯৪৩০০৫০৫৯৯

শ্রী মনোজ ভাই

সাইক্লোন ইন্ডিয়া

২২৫, জয়গোপাল ইন্ড.

ভবানীশঙ্কর মার্গ, দাদর (পশ্চিম)

মুম্বাই - ৪০০ ০২৮

ফোন - ০২২-৩০৪৮৪৮৩০

ড. হেমন্ত ভাই পারিখ

২১, তেজপাল সোসাইটি

(ফতেপুরা বাস স্ট্যান্ড-এর নিকট)

পালডি, আহমেদাবাদ-৩৯০০০৭

ফোন - ০৭৯-৩৬৬৩০০০৬

JAILOR

by

JAINACHARYA VIJAY ABHAYSEKHARSURI

: প্রকাশক :

ভুবনে ধর্মজয়কর প্রকাশন

শ্রী গিরিশভাই বড়েচা

১০১, সমিত শেখর অ্যাপার্টমেন্ট, কাজী ময়দান, গোপীপুরা

সুরাত-৩৯৫০০১, ফোন ঃ ০২৬১-২৫৯৯৩৪৭

: প্রকাশকাল :

১৫ আগস্ট, ২০২২

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

: অলংকরণ ও মুদ্রণ :

ডাটা পয়েন্ট

১, রামানন্দ লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬

মূল্য : ₹ ৯৯.০০

উৎসর্গ

‘অমিচন্দ কী অমিদৃষ্টি’, ‘গুণসেন-অগ্নিশর্মা’ ইত্যাদি গ্রন্থ এবং দিব্যদর্শন সাপ্তাহিকের বহু সম্পাদকীয় দ্বারা অনেক দুষ্কৃতীর কুচিন্তাকে ক্ষমা এবং বন্ধুত্বে পরিবর্তিতকারী স্ব. পূজ্য গুরুদেবশ্রী ভুবনভানু সুরীশ্বরজী মহারাজকে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বিষয় ক্ষমা-মৈত্রী বিষয়ক তাঁর বিচারবীজ থেকে পল্লবিত এবং বিকশিত এই নিবন্ধ তাঁর শ্রদ্ধা, আদর এবং ভক্তির সঙ্গে সমর্পিত করে আনন্দ অনুভব করছি।

—অভয়শেখর

শ্রী শান্তিনাথায় নম। শ্রী শঙ্খেশ্বর পার্শ্বনাথায় নমঃ

সিরসা বন্দে মহাবীর। উদ্দেশ্য নমঃ সিদ্ধাম

বিজয় প্রেম ভুবনভানু-জয়ঘোষ-ধর্মজিৎ-জয়শেখর-অভয়শেখরসুরিভ্যো নমঃ।

(ক্ষমাদেবীর প্রতিষ্ঠার আমন্ত্রণ পত্রিকা)

চিন্টু পিন্টুকে জিজ্ঞেস করল—কে অপরাধ করে অপরাধ স্বীকার করে না?

পিন্টু—শয়তান।

চিন্টু—কে তার দোষ স্বীকার করে?

পিন্টু—জ্ঞানী মানুষ।

শেষ পর্যন্ত, চিন্টু জিজ্ঞাসা করল—এমনকী, যদি এটি তার ভুল না হয়, তবে যিনি গ্রহণ করে এবং ক্ষমা চান কে?

পিন্টু—স্বামী।

যিনি বিবাহিত জীবনে এই শান্তি সূত্র গ্রহণ করেন তাঁকে স্বামী বলা হয়। কিন্তু আমি বলতে চাই যে দৃশ্যমান, দৈনন্দিন ঘটনা (অতীতের সম্ভাবনা অনুমান করে) তার নিজের কোনো অপরাধ না থাকলেও, যে নিজেকে অপরাধী মনে করে, সে জীবনে শান্তি পায়, সেইসঙ্গে শুধু তার স্ত্রীও হয়ে ওঠে। পৃথিবীর মানুষের হৃদয়ের কর্তা, এবং তিনি এমন ক্ষমতাও অর্জন করতে পারেন যে তিনি ভবিষ্যতে জগৎপতি হতে পারেন।

অন্যের দুষ্টতার কারণে আমাদের নিজেদেরই সহ্য করতে হয়, তবু অন্যের দোষ না দেখে, নিজেকে অপরাধী হিসেবে গ্রহণ করা, এটাই অনন্তকাল থেকে আমাদের জিনিস।

(১) নিজের ছাড়া অন্য সকলের দোষ, অপরাধবোধ দেখার প্রবণতা।

(২) এই কারণে বারবার সেই জীবের প্রতি ঘৃণা পোষণ করার প্রবণতা, এবং

(৩) এই সবের মূলে রয়েছে আমাদের তীব্র অহং প্রবৃত্তি।

এই সব কারণে এটি খুব কঠিন। হ্যাঁ, এটা কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়।

ক্রোধ অনন্তকাল থেকে আমাদের জীবনে দৃষ্টান্তভাবে বসে আছে, কিন্তু এটি একটি প্রকৃতি নয়, এটি একটি অনুভূতি। রাগ আমাদের প্রাকৃতিক বাড়ির অংশ নয়, এটি একটি বাহ্যিক কারণ। তিনি আমাদের মনের ঘরে অনন্তকাল ধরে বসে আছেন, কিন্তু তিনি এই স্বভূমির মালিক নন, তিনি একজন অনুপ্রবেশকারী। আমরা এটিকে তাড়িয়ে দিতে পারি, আমরা তাড়িয়ে দিতে পারি ... আমরা এটি নির্মূল করতে পারি।

আমরা যদি চাণক্য নন্দবংশকে নির্মূল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তার চেয়ে বেশি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি, তাহলে কী অসম্ভব হতে পারে?

রাগ একজন কলহপ্রিয় স্ত্রী। সেই কারণে, আমরা আমাদের প্রেমময় মা ক্ষমা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। ক্ষমাশীল একজন মায়ের কোল এত আরামদায়ক, তার এমন জীবনীশক্তি আছে যা আমাদের শুধু সুখই দেয় না, আমাদের আপত্তিগুলিকে সম্পদে, অসুবিধাকে আনন্দ এবং দুঃখকে উৎসবে রূপান্তরিত করে।

পার্থক্যকে সুযোগ করে দেওয়ার ক্ষমতা তার আছে।

ক্ষমাদেবীর কাছাকাছি যাওয়ার জন্য আমাদের কী করা উচিত—ক্ষমা?

এই প্রশ্নের উত্তর এই বই—জেলর! কর্মী বিচারক, হয়ানি কারারক্ষী এবং আমরা অপরাধীরা। ...এই ত্রিভুজ ঘটেছে। এই ত্রিপদীর ভিত্তি গ্রহণ করে, বিস্ময়কর দর্শনে মাস্টার স্বামী পূজ্যপাদ গুরুদেবশ্রী এটিকে যুক্তি, এবং দৃষ্টান্ত দিয়ে এত সুন্দর, নির্ভুল, হৃদয়গ্রাহী শৈলীতে উপস্থাপন করেছেন যে বইটি পড়ার পর অন্যদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই পরিবর্তিত হবে।

অপরাধ ছাড়া কোনো শাস্তি নেই, ভালো পুরস্কার ছাড়া কোনো পুরস্কার নেই।

X খারাপ, আমাকে কষ্ট দিচ্ছে ... আপনি যতবার এইভাবে চিন্তা করবেন, ততবার আপনাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং আমার কর্মটি দুষ্ট, তাই যতবার আপনি চিন্তা করবেন, ততই আপনি মহৎ পুরস্কার পাবেন।

অন্যান্য জীবের দ্বারা সৃষ্ট যন্ত্রণা সমানভাবে সহ্য করা স্বার্থের শর্টকাট।

কর্ম-সত্তার দ্বারা আপনার রাগ সহ্য হবে না।

এরকম অনেক মর্মস্পর্শী বাক্য আমাদের মনের মধ্যে লিপিবদ্ধ হওয়ার

যোগ্য, যেমন বাসায় এবং অফিসে বোর্ডে লেখা। কেন এমন অনেক সুন্দর বাক্যে পূর্ণ এই বইয়ে কর্মফলকে বিচারক হিসেবে বিবেচনা কবেন? যদি চরিত্র হারিয়ে যায়, সবকিছু হারিয়ে যায়—কীভাবে? প্রকৃতির গেম শো, পেট্রোল, জল, স্পার্ক ইত্যাদি অনেক কিছু যুক্তি ও যুক্তিসহ অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে এত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে হৃদয়ের জায়গায় পাথর থাকলেও তা প্রবেশ করতে পারে না।

পূজ্যশ্রী শুধু বিখ্যাত ও কুখ্যাত দৃষ্টান্তই আমাদের সামনে রাখেননি, তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, সেটা অগ্নিশর্মার গল্প হোক বা নাগকেতুর উদাহরণ। পূজ্যশ্রীর প্রজ্ঞা অক্ষয়। তার উজ্জ্বলতা দর্শনে নতুন দিগন্ত স্পর্শ করে এবং তার সমবেদনা হল চিরপ্রবাহিত গঙ্গা। চিন্তা করা তার শখ বা ব্যাবসা নয়—এটি একটি স্বজ্ঞাত প্রকৃতি।

বইটি 'হংস তু ঝিল মৈত্রী সরোবরে' অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই বইটি অনেকের মনে রাগকে বিঘ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে, তাই আমি মনে করি অনেক লোকের হৃদয়মন্দিরে সেখানে প্রবেশ না করেই প্রতিষ্ঠিত এই রাগের কোনো বিকল্প নেই। এখন রাগের উসকানি অনেক বাড়িতে, অনেকের হৃদয়ে উদযাপিত হবে।

ক্ষমাদেবীর মর্যাদার জন্য আমন্ত্রণপত্র প্রত্যেকটি ব্যক্তির চোখে পড়বে।

পূজ্যশ্রীর এত বড় অনুগ্রহকে স্বাগত জানানোর একমাত্র উপায়, সচেতনভাবে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করা—ক্রমাগত অধ্যয়ন-পাঠ, অবিলম্বে মনন, অবিলম্বে পদক্ষেপ! এবং...অন্যান্য মানুষের উপর এর প্রভাব।

—অজিতশেখরবিজয়

মাতঙ্গ সিদ্ধায়িকা পীপূজিতায় শ্রী বর্ধমান স্বামিনায় নমঃ।
শ্রী বিজয় প্রেম-ভুবনভানু-জয়ঘোষ-ধর্মজিৎ-জয়শেখর সুরিশেভ্যে নমঃ।

॥ কিছু কথা ॥

সূর্যাস্তের সময় ঘনিয়ে এসেছে। শিষ্য তার হাতে জলের পাত্র নিয়ে গুরু ভগবন্তকে অনুরোধ করছেন : গুরুদেব! জলপান করুন... কিন্তু গুরুদেব, কিছু গুরুতর চিন্তায় মগ্ন, কলমে সাহায্যে কাগজে মনের দ্রুত গতিশীল চিন্তাকে চিহ্নিত করতে ব্যস্ত। আমার এই চিন্তাগুলি লিপিবদ্ধ করা যাক, অন্যথায় এটি কোথাও অদৃশ্য হয়ে যাবে। ...একবার ...দু'বার ...তিনবার ... শিষ্য বলে চলে ... জলের পাত্র তেমনই পড়ে থাকে... সূর্য ডুবে যায়।

শুধু আজ নয়, একবারও নয় ... বহুবার যার জীবনে এটি ঘটেছে, মহোপাধ্যায় যশোবিজয়ী মহারাজ প্রায় ৩২৫ বছর আগে ভারতের মাটিতে বিচরণ করতেন। তিনি শুধু জৈন ধর্মগ্রন্থ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেননি, পাশাপাশি বৌদ্ধ, বেদান্ত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থও তিনি সমানভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি নিজে শত শত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শাস্ত্রের আরাধনায় তাঁর সমগ্র জীবন কাটানোর পর, তাঁর জীবনের সন্ধ্যা সময়, তিনি একটি চমৎকার বই রচনা করেছিলেন—জ্ঞানসার ...

এই বই থেকে একটি শ্লোকের প্রথম অর্ধেক হল :

সাম্যং বিভর্তি য় ; কর্মবিপাংক হৃদি চিন্তায়ন ...

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি হৃদয়ে কর্মফল দ্রবীভূত করার চিন্তা করে, সে সমতা ধরে নেয়।

বর্তমান যুগের মানুষের জন্য একটি ঘন ঘন নিরাময় আছে যারা দুশ্চিন্তা, চাপ, বিষণ্ণতা ইত্যাদি ভুগছে — কর্মের বিলুপ্তির চিন্তা-ভাবনা সারা বিশ্বে খোঁজাখুঁজি বা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেও মনের শান্তি বা স্বাস্থ্য নিশ্চিত প্রতিকার যা খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে মানুষ বুদ্ধির গুরুত্ব এতটা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এটাকে কুসংস্কার বলে বিশ্বাসের অবমূল্যায়ন করেছে।

এই কারণে, সুপারসেন্সরি কর্মের গ্রহণযোগ্যতা বিরল হয়ে গেছে, গডগিফটের মতো অলৌকিক উপহারে ফলস্বরূপ, এটি শত শত যোজন দ্বারা চলে গেছে ...

কিন্তু কিছু মনে করবেন না, কণ্টক ব্যবহার করা হয় কাঁটা দূর করতে ... বিশ্বাসের সাহায্যে নয় ... বুদ্ধির সাহায্যে ... যদি যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাহলে আমরা কি কর্মের নীতি মেনে নেব নাকি? কর্মবিজ্ঞানে পিছনে, 100% শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে। এটিকে আজকের ভাষায় প্রকাশ করার প্রয়াস অর্থাৎ বর্তমান বই—জেলর। এই বইতে উপস্থাপিত যুক্তিটি কতটা শ্রদ্ধাশীল এবং এটি নিজেও কতটা যুক্তির বাইরে কেবল বইয়ের পাতাগুলোই বলবে।

মনের শান্ত বা অস্থির থাকা পরিস্থিতির ভিত্তি নয়। এমন একটি পরিস্থিতিতে যা মনকে খুব ব্যথিত করে, এমনকী, যদি সামান্য পরিবর্তন না হয়, তবুও সঠিকভাবে পরিবর্তিত আদর্শ মনকে শান্তিতে ভরে দেয়। আমি প্রত্যেক পাঠককে এই বাস্তবতাটি নিজের জন্য অনুভব করার অনুরোধ করছি।

পুনরাবৃত্তি (একই কথা বার বার বলা) সাধারণত সাহিত্যে একটি ত্রুটি হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু রোগের চিকিৎসার জন্য বার বার ঔষধ খাওয় প্রয়োজন এবং তা উপকারী। বর্তমান বইটিও মানসিক চিকিৎসার একটি ফর্ম এবং এই কারণে কিছু জিনিস—যেমন অগ্নিশর্মার গল্প—বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনেকবার বলা হয়েছে, সেই বর্ণিত ঘটনাটি ব্যাখ্যার কারণে সেগুলি উপকারী প্রমাণিত হবে।

উপস্থাপিত বইয়ের দিকে।

শুধু দেখার জন্য নয়, আত্তীকরণের জন্য। শুধু পড়া নয়, মুখস্থ করতে হবে। পড়া শুধু আনন্দ পাওয়া জন্য নয়, জীবনে তা অনুসরণ করা। যদি এটি হয়, তাহলে ... অপূর্ব শান্তরসে অনন্য শক্তিগুলি অন্তরে অন্তর থেকে উঠবে এবং আপনি এটি স্পষ্টভাবে অনুভব করতে সক্ষম হবেন।

'হাঁস! তুম ঝিল মৈত্রী সরোবরে'র বইটি হাজার হাজার অ-জৈন মানুষের হৃদয়ে শান্তির ঢেউ তুলেছে, এই বই সেই তরঙ্গগুলিকে আরও দৃঢ় এবং দীর্ঘস্থায়ী করতে সহায়ক হবে। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

পরব্রহ্মমূর্তি খ.পু.আ. শ্রী বিজয় প্রেমাসুরি শ্রীজী মহারাজ, অপ্রামাদমূর্তি মরহুম আচার্য বিজয় শ্রী ভুবনভানুসূীশ্বজী মহাজ, জীবন্ত জ্ঞানী মূর্তি প.পু.

আচার্য গচ্ছাধিপতি শ্রী বিজয় জয়ঘোষসুরিশ্বরজি মহারাজ, সরলতমূর্তি প্রয়াত। এম.এস. আচার্য শ্রী বিজয় ধর্মজিৎ সুরিশ্বরজি মহারাজ, শ্রী সুরিমন্ত্র সাধনামূর্তি খ.পু. আচার্য শ্রী বিজয় জয়শেখর সুরেশ্বরজি মহারাজ ...। এই সুপরিচিত গুরু ঐতিহ্যের ক্রমাগত বর্ষিত কৃপা এই প্রবন্ধের খ্যাতির প্রকৃত প্রাপ্য এবং তা পরে—দ্বিতীয় স্থানে প্রতিটি কাজে সহশিষ্যদের ভক্তি সহযোগিতার অধিকারী।

আচার্য শ্রী বিজয় অজিতশেখসুরিশ্বরজি এই প্রবন্ধটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়েছেন এবং বিভিন্ন তথ্যের সাথে একটি সুন্দর ভূমিকা লিখে এটিকে সাজিয়েছেন। ধন্যবাদ।

অনেক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করার পরেও নতুন শাস্তির সম্ভাবনা উপস্থাপনের ক্ষতিকর ব্যবসা থেকে বেরিয়ে আসা। ...একটি শাস্তি সহ্য করা এবং দশটি শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার মাধ্যমে, একটি মহৎ পুরস্কার পাওয়ার ক্ষমতা অর্জন করা যায় ... এবং এই দুইয়ের চেয়ে অনেক মূল্যবান কিছু ... ক্ষমা এবং সমতা চর্চা করে, কেউ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এগুলি সমাধান করার সর্বোত্তম উপায়গুলি খুঁজে পেতে, এই প্রকাশটি ব্যবহার করুন এইরকম সহানুভূতিশীল অনুপ্রেরণার সাথে জীবনকে আলিঙ্গন করতে।

চৈত্র শুক্লা ১, বি.সং. ২০৬৭, **... আ. অভয়শেখর সুরি**

ভায়ন্দর।

সূচিপত্র

১.	জেলর	... ...	১৫
২.	কর্মশক্তি	... ...	৪১
৩.	সাজানোর উপায়...	... ...	৫৭
৪.	অপরাধকে ভয় পান	... ...	৬৪
৫.	সমতা : স্বার্থের ছোট আকার	... ...	৭৫
৬.	বিড়ালের আশ্রয়ে ইঁদুর	... ...	৮৬
৭.	ট্যাঙ্কার : পেট্রোলের নাকি জলের	... ...	১০৯
৮.	পেট্রোল - জল	... ...	১১৮
৯.	পরকালে মহান পুরস্কার	... ...	১৩৩

শ্রী শংখেশ্বর পার্শ্বনাথায় নমঃ

মাতঙ্গসিদ্ধায়িকা পরীপুজিতায় শ্রী বর্ধমানস্বামিনায় নমঃ।

শ্রী বিজয় প্রেম-ভুবনভানু-জয়ঘোষ-ধর্মজিৎ-
জয়শেখরসুরিশ্বরেভ্যো নমঃ ওঁ নমঃ।

১. জেলর

সন্তপুরুষ সাধু সমাবেশে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন:

সাধু: কে সুখ চায়?

সমাবেশ: সবাই ... সে গরিব বা ধনী, অসুস্থ বা সুস্থ ... শিক্ষিত বা নিরক্ষর ... সবাই সুখ চায়।

সাধু: তুমি কখন সুখ চাও? দিনে না রাতে? সকালে বা সন্ধ্যায়?

বাড়ি: বারো মাস ... চব্বিশ ঘণ্টা ...

সাধু: দুঃখ কার দরকার? কখন করা উচিত?

সমাবেশ: কেউ দুঃখ চায় না। এমনকী উচিত নয় ...

সাধু: পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কোম্পানি আছে। সাধারণ নিয়মে কোন কোম্পানি মাল বানাতে চান?

সমাবেশে কিছু লোক: শ্রেষ্ঠতম মত।

অন্য কিছু মানুষ: এই ধরনের পণ্য সর্বোচ্চ মুনাফা হওয়া উচিত ...

সাধু: না, পণ্য যতই ভালো বা লাভজনক হোক না কেন, কিন্তু যদি এর কোনো চাহিদা না থাকে? সুতরাং সাধারণ নিয়ম হল যে কোনো কোম্পানি শুধুমাত্র সেই পণ্যগুলি তৈরি করতে চায় যার বাজারে চাহিদা আছে। কোনো কোম্পানি এমন পণ্যও তৈরি করে না, যার কোনো চাহিদা নেই। তাহলে কুদরত নামে একটি কোম্পানি কেন দুঃখ নামে একটি পণ্য তৈরি করে যখন বাজারে দুঃখ নামক দ্রব্যের একেবারে চাহিদা নেই। এমনকী, যদি কেউ এটি বিনামূল্যে দিতে চায়, কেউ এটি হাতে নিতে প্রস্তুত নয়। সবাই সুখ এবং সুখ চায়। অতএব, প্রশ্ন উঠছে যে, যখন একটি একক প্রাণী কষ্ট করতে চায় না, তাহলে প্রকৃতি কেন ব্যথা দেয়? যদিও এই প্রশ্রে শাস্ত্রীয় উত্তর হল 'কর্ম', কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর স্থানীয় ভাষায় খুঁজে বের করতে হবে, এবং তার জন্য একটি কারাগারের একটি জরিপ করতে হবে। ৫০-১০০-২০০ সমস্ত বন্দি যারা সেখানে আছে, তাদের সবাইকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত—"বলো, তোমাদের মধ্যে কার শাস্তির প্রয়োজন?" উত্তর কী হবে?

কেউ না।

এখন প্রশ্ন জাগে যে, যখন একক বন্দিও শাস্তি পেতে চায় না, তখন আদালত কেন তাকে শাস্তি দেয়?

সে অপরাধ করেছে তাই তাকে শাস্তি দিতে হবে।

এটা ঠিক ... তাই এই থ্রেড নিশ্চিত যে অপরাধ ছাড়া কোনো শাস্তি নেই? যদি শাস্তি হয়, তাহলে অবশ্যই অপরাধ থাকতে হবে এবং এটিও মূল্যবান, কারণ যখন আমরা শাস্তি দেখি, তখন আমরা কেবল অপরাধের কল্পনা করি। প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে যেমন আওয়াজ আসছে ... বাবা মারছে, ছেলে কাঁদছে আর কাঁদছে। ছেলে কী করেছে তা আমরা না জানলেও, আমরা এখনও কল্পনা করি যে সে অবশ্যই পরীক্ষায় ফেল করেছে, অবশ্যই কিছু ক্ষতি করেছে, বা পিতামাতার অসম্মান করেছে।

পশুর গলায় একটি লাঠি বাঁধা থাকে, যা তার পা দিয়ে আঘাত করতে থাকে এবং দম বন্ধ রাখতে থাকে। আমর যদি পনেরো থেকে বিশটি পশুর মধ্যে যে কোনো একটি প্রাণীর আগুনে এমন কাঠ দেখতে পাই, তাহলে আমরা কল্পনা করি যে এই প্রাণীটি মালিকের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না, তাই তাকে এভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ শাস্তি শুধুমাত্র যে কোনো অপরাধের জন্য দেওয়া হয়, তাই অপরাধ ছাড়া কোনো শাস্তি হয় না! এটি একটি অনস্বীকার্য বিষয়।

এখন একটি ভিন্ন পরিস্থিতি চিন্তা করুন। বাবা ছেলেকে হত্যা করছে না ... তার প্রশংসা করছে ... তাকে কিছু পুরস্কার দিচ্ছে। এটা দেখে আমরা কী কল্পনা করব?

ছেলে নিশ্চয়ই কিছু ভালো কাজ করেছে।

অতএব, দ্বিতীয় সূত্রটি সুনির্দিষ্ট—

সম্মান ছাড়া কোনো পুরস্কার নেই।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন—আমাদের জীবনের প্রেক্ষাপটেও এই দুটি উত্তর দেখা উচিত। শারীরিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক ইত্যাদি অনেকগুলি বিভিন্ন পরিস্থিতি সংকলন ... এটি আমাদের জীবন। এই পরিস্থিতিগুলির মধ্যে যা মনোরম, সন্তোষজনক তা হল প্রকৃতি দ্বারা প্রদত্ত সমস্ত পুরস্কার ...

পুরস্কার আছে ...

অবশ্যই, আমরা এর উপযুক্ত কাজটি করতে এসেছি এবং যে পরিস্থিতিতে আমরা ভুগছি, আমরা বিচলিত হচ্ছি, যার জন্য আমরা অভিযোগ করছি যে

কেন এমন হচ্ছে? এই ধরনের বেদনাদায়ক পরিস্থিতি প্রকৃতি দ্বারা আমাদের দেওয়া শাস্তি। নিশ্চয়ই আমরা এমন কিছু অপরাধ করে এসেছি।

একজন মানুষ ... যিনি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এত যত্নবান ... আমি যদি এটা খাই তাহলে বি.পি. বাড়বে ... যদি আমি এটা খাই তাহলে সুগার ... এটা খাওয়া যাবে না এবং সেটাও খাওয়া যাবে না। এত যত্ন যে কখনও কখনও না খাওয়া জিনিসগুলির তালিকা খাওয়ার আইটেমের চেয়ে দীর্ঘ হয়ে যায় এবং তবুও ''আজ চিনি বেড়েছে...'' এবং ''আজ একটু জ্বর আছে''... প্রতিদিন কিছু সমস্যা আছে ... এবং অন্য একজন মানুষ ... কোনো ধরনের সতর্কতার বিষয় নয়। যখন সে চায়, সে যা চায় তাই খায়। এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ—সুস্থ। কোনো অভিযোগ নেই। এটা কি দেখা যায়?

সভা : পাওয়া যায় ...।

এটা দেখা উচিত? যে স্বাস্থ্যের যত্ন নেয় তার সুস্থ থাকা উচিত বা স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া উচিত নয়? তাহলে উল্টোটা দেখা যাচ্ছে কেন? বলুন, প্রকৃতি এই অন্য মানুষটিকে স্বাস্থ্যের পুরস্কার দিতে চায়। যা মনে আসে, খাওয়া-দাওয়া করুন, আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আরে! প্রকৃতি এই কথা বলে—যদি আপনি একটি পাথর খান, আমি আপনাকে এটি হজম করার ক্ষমতা দেব। আমি পাথর হতে দেব না, কারণ আমি আপনাকে স্বাস্থ্য দিয়ে পুরস্কৃত করতে চাই। এবং একই প্রকৃতি প্রথম ব্যক্তিকে বলে যে আমি আপনাকে শান্তিতে থাকতে দেব না। আপনাকে প্রতিদিন কিছু না কিছু ব্যথা সহ্য করতে হবে।

একজন যুবক যিনি শিক্ষিত-অভিজ্ঞ এবং যথাযথ পরিকল্পনা নিয়ে ব্যবসা করছেন, এখনও অর্থ উপার্জন করতে পারেননি। আর একজন যুবক ... সুশিক্ষিত নয়, পরিকল্পনা নেই, নিজের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবসা করছে ... এবং তবুও সে দৃষ্টিশক্তিতে পরিণত হয়। এটা কি পৃথিবীতেও দেখা যায়? কেন? বলুন, প্রকৃতি এই অন্য যুবককে বলছে যেন আমি আপনাকে সম্পদের উপহার দিতে চাই। এমনকী, যদি আপনি কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই ব্যবসা করেন, আমি আপনার আশপাশের মানুষকে এবং পরিস্থিতি অনুকূল করে তুলব যাতে আপনি লাভ পাবেন এবং একই প্রকৃতি সেই প্রথম যুবককে বলছে যেন আপনি পুরো ঘটনাটি নিয়ে ব্যবসা করেছেন কিন্তু আমি আপনাকে উপার্জন করতে দিতে চাই না। আমার ক্ষমতা অসীম। আমি আপনার সবচেয়ে বিশ্বস্ত

দালালকে বিশ্বাসঘাতকতায় প্ররোচিত করব ... আমি বাজারের দিক পরিবর্তন করব ... আরে! প্রয়োজনে আমি নিজেই সরকারের নীতি পরিবর্তন করব। কোনোভাবেই আমি আপনাকে সুবিধা নিতে দেব না কারণ আমি আপনাকে দারিদ্রের জন্য শাস্তি দিতে চাই। কেউ কেউ প্রথম প্রচেষ্টায় সাফল্য পায়, আবার কেউ অক্লান্তভাবে—অনেক চেষ্টার পরও প্রত্যাশিত সাফল্য পায় না।

কেন একজনকে পুরস্কৃত করা হয় এবং অন্যকে শাস্তি দেওয়া হয়? কে নিজের এবং কে প্রকৃতির জন্য পর? বলুন, প্রকৃতি যারা ভালো কাজ করেছে তাদের পুরস্কৃত করে। যারা অপরাধ করেছে তারা প্রকৃতির দ্বারা শাস্তি পায়।

একজন লোক চুরি করেছে, ডাকাতি করেছে। আরে! কাউকে খুনও করেছে। পুলিশ তাকে ধরল। তা মামলা আদালতে চলল এবং বিচারক শাস্তি দিল—দশ বছরে সশ্রম কারাদণ্ড এবং প্রতিদিন দশ ঘা চাবুক।

জেলর সেই বন্দিকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করায়। সন্ধ্যা নামার সাথে সাথেই সে একটা চাবুক এনে বলল, চল চাবুক খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যা। বন্দি বলে আমি কী দোষ করেছি? আমি মার খানেওয়ালা নই। আমিও চাবুক দিয়ে তোমায় মারব ... তাহলে কি তার সাজা কমানো বা বাড়ানো হবে? .

সভা—বাড়ানো হবে।

বন্দির কথাটা কি ভুল? তিনি কারাগারের কী দোষ করেছেন? তিনি বলতে পারেন, ‘‘যার বাড়িতে আমি চুরি করেছি, সে আমাকে মারতে পারে, তাহলে তুমি কেন মারবে? আমি কি তোমার বাড়িতে একটু চুরি করেছি?’’ তাহলে কারারক্ষীর হাতে বন্দিকে কেন মার খেতে হবে? এবং যদি তিনি এই ধরনের শাস্তির বিরোধিতা করেন, তাহলে শাস্তি বাড়ানো হল কেন?

সভা—আদালতের আদেশে তখন কারারক্ষী মারে।

সঠিক। বন্দির বোঝা উচিত যে আদালতের আদেশের কারণে কারারক্ষী মারছে নিজের ইচ্ছায় নয়।

কেন্দ্রীয় সরকার যদি এমন রেগুলেশন পাস করতে চায় যাতে সারা দেশে কোনো আদালত না থাকে, কোনো জেল না থাকে, কোনো জেল না থাকে, কোনো শাস্তি না হয়। যে যা চায় তাই করবে, কোনো শাস্তি হবে না। সকার যদি এ ধরনের প্রস্তাব আনতে চায় এবং আমাদের মতামত জানতে চায়, তাহলে আমরা হ্যাঁ বলব কি না?

সভা—আমি অবশ্যই বলব না।

কেন? কারণ আমরা জানি এটা করে দেশে কোনো ভালো কাজ হতে পারে না। উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র। আমাদের পক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর মানে হল যে দেশে যদি আদেশটি বজায় থাকে, তাহলে আদালত পদ্ধতিগতভাবে সক্রিয় এবং আজও দেশে যত অংশে আদালত নিষ্ক্রিয় রয়েছে ততই অগ্রগতি রয়েছে। দেশে যেমন সিস্টেমটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঠিক তেমনই গোটা বিশ্বে—পুরো মহাবিশ্বেও। তাই অবশ্যই কিছু আদালত এই সমগ্র বিশ্বে সক্রিয় থাকতে হবে। এই আদালতের নাম কর্মসত্তা। ভারত সরকার শুধুমাত্র মানুষকেই তার প্রজা হিসেবে বিবেচনা করে। প্রকৃতির নিয়ম, যা এই কর্ম-সত্তার দরবার প্রতিষ্ঠা করে, কেবল মানুষ নয়, ক্ষুদ্র প্রাণী যেমন পশু, পাখি, পোকামাকড় ইত্যাদি বিবেচনা করে। এই প্রাণীগুলির মধ্যে কেউ নাবালক যারা বড়দের মতো অপরাধ করে, এই ধরনের শাস্তি এই আদালত দ্বারা দেওয়া হয়। কিন্তু ...?

আদালতের কাজ শুধু শাস্তি নির্ধারণ করা যে দশটি চাবুক আরোপ করা উচিত ইত্যাদি ... বিচারক নিজে কারাগারে না এসে বন্দিকে মারধর করেন। শাস্তি কার্যকর করা জেলারের কাজ। একইভাবে, কর্মসত্তার আদালতও কেবল শাস্তির সিদ্ধান্ত দেয়। তাহলে কারা কারা তা কার্যকর করবেন?

জ্ঞানী পুরুষ বলছেন যে এই জেলর আপনার ভাই হতে পারে অথবা ভাগ্নেও হতে পারে অথবা অংশীদার, চাকর বা প্রতিবেশীও হতে পারে। শাশুড়ি বা পুত্রবধূ হতে পারে। এটি দেবরানি বা জেঠানিও হতে পারে। হ্যাঁ, আমাদের আশেপাশের সমস্ত জীবন্ত প্রাণী এই আদালতের কর্মচারী, জেলার। এই সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ এই কারাগারের যে কোনো একজনকে আদেশ দেয়—যান, এই লোকটিকে গালি দিয়ে আসুন। সে তোমাকে অপব্যবহার করতে চায়নি। কিন্তু সেই চিঠি ছিল। তোমাকে গালি দিয়ে চলে গেল। অন্য একজনকে আদেশ দিলেন—''এটা একটা চড় হতে হবে।'' তিনি আপনাকে একটি চড় মেরেছিলেন। একই কর্ম-সত্তা কাউকে বলেছিল, ''এই ব্যক্তি এমন একটি অপরাধ করেছে, যার শাস্তি হল তার এক লক্ষ টাকা ক্ষতি।'' ''অর্ডার মেনে চলুন'' সেই প্রাণীটি আপনার ব্যবসার মধ্যে এমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে যে আপনি এক লক্ষ টাকা হারিয়েছেন।

অপব্যবহারকারী, চড় মেরে বা ক্ষতিকারী ... সব কিছুর পরেও তারা সবাই কারাগার। তাই যদি আমরা গালি দাতাকে বলি, ''ভালো মানুষ! আমি তোমার কী দোষ করেছি যে তুমি আমাকে গালি দিচ্ছ? আপনি যদি আমাকে গালি দেন, আমিও আপনাকে গালি দেব। তাহলে শাস্তি বাড়বে না কি কমবে?"

সভা—বাড়বে।

আমাদের কি শাস্তি বাড়ানো উচিত নাকি কমানো উচিত?

কমাতে হবে।

যদি আপনি কমাতে চান তাহলে এর জন্য কী করা উচিত? নিজেই বন্দির রেফারেন্স নিন।

যদি সে একটি চোরকে আঘাত করার চেষ্টা করে, তাহলে শাস্তি বৃদ্ধি পায়। শাস্তি বাড়লেও সে হয়তো পাল্টা আঘাত করবে না কিন্তু প্রতিশোধ নেবে অথবা পালাবে। আরে, যদি সে খুন করে কিন্তু অনেক কারচুপি না করে, তবুও সাজার কোনো অভাব নেই। শাস্তি কমাতে, বন্দির কাছে একটাই সমাধান—চুপচাপ মার সহ্য করা।

একইভাবে কর্মসত্তার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি কমানোর একমাত্র উপায় আছে এবং তা হল শান্তিপূর্ণভাবে সহ্য করা।

প্রশ্ন: কিন্ত আমাদের যদি একটি গালির জবাবে দুটি গালি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে, তাহলে কেন আমরা তা সহ্য করব?

উত্তর: এইভাবে, কখনও কখনও বন্ধি জেলরের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হতে পারে, একজন কুস্তিগিরের মতো শক্ত। তারপরও যদি শাস্তি বাড়ানো হয়, তাহলে তাকে সব কিছু শান্তিপূর্ণভাবে সহ্য করতে হবে, তাই না?

আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে ভগবান মহাবীরের কানে পেরেক পুঁতেছিল তার শক্তি কি বেশি না কি ভগবান মহাবীরের?

ভগবান মহাবীরের।

তাহলে কেন প্রভু তাকে তার কানে পেরেক মারতে দিলেন? ''এখানে এসো, তুমি আমার কানে হাতুড়ি মারতে চাও?" এই বলে, যদি তার কান উঁচু করা হত, সে চিৎকার-চেঁচামেচি করে পালিয়ে যেত। প্রভু এমন কোনো আক্রমণ করেননি, প্রতিশোধও নেননি, বা সেখান থেকে পালাতে পারেননি। শান্তিপূর্ণভাবে নিচে নামার ভয়াবহ যন্ত্রণা নিয়েছেন। কেন? কারণ, প্রভু

জানতেন যে এটি কেবল একজন জেলর। যিনি আমার নিজের অপরাধে কর্ম-সত্তার দেওয়া শাস্তি কার্যকর করেন। আমি প্রতিশোধে গরুদের উপর হামলা করে আমার শাস্তি বাড়াতে চাই না।

তুমি জানো প্রভুর অপরাধ কি ছিল, তাই না?

অষ্টাদশ ভবে প্রভুর আত্মা তিন খণ্ডের সম্রাট ত্রিপৃষ্ঠ বাসুদেবের রূপে ছিলেন। রাতে ঘুম হয়নি। তাই সঙ্গীতশিল্পীদের ডাকা হয়েছিল। ''নরম, সুরেলা সঙ্গীত বাজান, আমি ঘুমাতে চাই।'' কিন্তু রাজা জানতেন যে, তিনি একজন সঙ্গীতশিল্পী। যদি তারা সঙ্গীতে মগ্ন থাকে, তাহলে তারা রাজা ঘুমিয়ে আছে কি জাগ্রত তা বিবেচনা করে না। অতএব, এর যত্ন নেওয়া দায়িত্ব বিছানা-রক্ষকের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। খেয়াল রেখো, যদি আমি ঘুমিয়ে পড়ি, এই লোকদের বিদায় করে দাও। গান শুরু হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজা ঘুমিয়ে পড়লেন। বিছানা-রক্ষক দেখলেন যে রাজা ঘুমিয়ে পড়েছেন, কিন্তু তিনি খুব জোরে গান শুনতে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। পাঁচ মিনিট শুনুন, তাপর এই শিল্পীদের বিদায় করুন। ''রাজাজি সবে ঘুমিয়ে পড়েছে। তুমি কি এত তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠবে?'' সঙ্গীত চলছিল। পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে, বেড কিপার কি সন্তুষ্ট হবে? আপনার জীবনেও একই ঘটনা ঘটে, তাই না? একটি অন্য দোকানে যাওয়ার সময় এবং অন্যদিকে টিভিতে আইপিএল ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে। আপনি ভেবেছিলেন—আমি দুই ওভার দেখব এবং তারপর আমি দোকানে যাব। তাহলে আপনি কি দুই ওভার দেখার পর দাঁড়াবেন?

সভা—না।

কখনও কখনও এটি দুই থেকে বারো হতে পারে। বিশ হতে পারে এবং দ্বিতীয় থিমকিও বিশ হতে পারে। এভাবেই পুরো ম্যাচ শেষ হতে পারে।

অন্তত আমাদের এ থেকে বোঝা উচিত যে ইন্দ্রিয় আত্মাকে দাস করে। যেন ইন্দ্রিয়গুলি জীবকে বলে—আপনি হয়তো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে দুই ওভার পরে আমি উঠে দাঁড়াব। কিন্তু আপনি যেখানে খুশি করতে পারেন? আমি তোমার সম্মতি না দেওয়া পর্যন্ত তুমি দাঁড়াতে পারবে না।

শয্যাপালকের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। এখন আমি আরো কিছু মুহূর্তের জন্য শুনব ... এবং কিছু মুহূর্তের জন্য ... এবং আরো কিছু মুহূর্তের জন্য ... আর কিছুক্ষণ পর রাজার ঘুম ভেঙে গেল ... সে জেগে উঠল।

মাঝখানে একটি প্রশ্ন—সঙ্গীত কি আপনাকে ঘুম পাড়ায় বা জাগিয়ে দেয়?

ঘুম আসে।

তাহলে কীভাবে জেগে উঠলেন?

ঘুম ভেঙে যায়।

তাহলে সংগীতশিল্পীদের কেন ঘুমের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল? বাস্তবতা হল গান শোনা ঘুমের কারণ হতে পারে এমনকী বিরতিও দিতে পারে। যদি আপনি যতটা প্রয়োজন গান শোনেন, তাহলে আপনি ঘুমান, যদি এটি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হয় তাহলে ঘুমও ভেঙে যেতে পারে। সব কিছুর ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য। প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিটি জিনিসের ব্যবহার লাভজনক হয়ে ওঠে। যদি এটি সেই সীমা অতিক্রম করে, এটি ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে। যেমন যদি আপনি প্রতিদিন ছয়টি রুটি খান। আপনি যদি জন্মদিন উপলক্ষে বারোটি রুটি খেয়ে থাকেন, তাহলে লাভ না ক্ষতি?

সভা—ক্ষতি।

আপনি জুতা বানাতে চান। মুচি মাপ নিয়ে বলল, শেঠ জি! নয় ইঞ্চি।

আপনি যদি মুচিকে বলেন—ভাই! নয়টা কেন? এটা শুধু দশ ইঞ্চি করে তৈরি করুন। তাহলে আপনার সুবিধা বা অসুবিধা হবে ... এটা উপকারী। যদি এর চেয়ে বেশি হয় তাহলে তা ক্ষতিকর। এখন একটি প্রশ্ন ...

ধরুন আপনার মাসিক খরচ হল পনের হাজার টাকা এবং আপনি এক লাখ পনের হাজার টাকা উপার্জন করুন। তাহলে লাভ না ক্ষতি? সর্বত্র অত্যন্ত নিষিদ্ধ। এই নিয়ম কি মানি-মানি-প্রপার্টির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়? যারা পাঁচ-পঁচিশ কোটি বা তার বেশ সম্পদ জমা করেছেন তারা প্রায়ই অনেক ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হন। এটি বোঝার জন্য আপনার দৃষ্টিও দরকার।

একটি খুব ছোট, পিছিয়ে পড়া গ্রামে, এমন একজন যুবক, যিনি তার শৈশব অতি দরিদ্র অবস্থায় কাটিয়েছিলেন, শহরে এসে ভাগ্য ফোনোর চেষ্টা করেছিলেন এবং মনে হচ্ছিল তাঁর গ্রহ জ্বলজ্বল করছে। ধীরে ধীরে, তিনি এগিয়ে যান এবং খুব ধনী হন। তাঁর একটি ছেলে ছিল। এটি ছিল প্রাসাদের মতো একটি বাসস্থান। এছাড়াও একটি সুইমিং পুল, একটি বড় বাগান এবং কেন্দ্রে একটি মালি ছিল। বড় বা ছোট প্রতিটি কাজের জন্য চাকর ছিল, একজন রাঁধুনিও ছিল যিনি খাবার রান্না করতেন। ছেলের জন্য একটি কুকুরও রাখা

হয়েছিল। জল চাইলে দুধ উপস্থিত থাকত। একজনকে ডাকলে চারজন চাকর এসে দাঁড়াত। যে পুত্র এইরকম সমৃদ্ধি এবং সুযোগ-সুবিধার মধ্যে বড় হয়েছে তার বয়স চৌদ্দ বছর। বাবা ভেবেছিলেন দারিদ্র্যও জীবনের একটি দিক। আমি এটা অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। ছেলেরও এই অভিজ্ঞতা হওয়া উচিত। তাই তাকে দরিদ্র্য পরিবারে রাখা উচিত—এক সপ্তাহের জন্য। এখানে বিনোদন এবং শখের কোনো মাধ্যম নেই, এমনকী সাধারণ সুবিধাও নাও থাকতে পারে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যেও অনেক ত্রুটি রয়েছে। তবেই সে জ্ঞান পাবে কীভাবে জীবন সংগ্রামে পূর্ণ। তার নিজ গ্রামেরএকজন পরিচিত তাকে দরিদ্র পরিবারে রেখে যান। বনের শেষে নদীর তীরে অবস্থিত এই গ্রামটি ছিল খুবই ছোট। যোগাযোগের কোনো মাধ্যম ছিল না। সতেরো পার হয়ে গেলে বাবা ছেলেকে ফিরিয়ে নিতে সেই গ্রামে চলে যান। ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এখানে ভালো লাগে?

ছেলে উত্তর দিল, বাবা, এই মানুষগুলোর জীবন ব্যবস্থা এবং আমাদের জীবনযাপনের মধ্যে পার্থক্য আছে। আমাদের বাড়িতে একটি ছোট সুইমিং পুল আছে এবং তাকে ক্লোরিন-বাসি জল—বাসি জল। আমার চোখে সবসময় জ্বলন্ত অনুভূতি ছিল। এখানে এই কুঁড়েঘরের পিছনে একটি নদী আছে। ক্রমাগত প্রবাহিত জল। কতটা সতেজ আর প্রাণবন্ত। বাবা! আমি চান করার সময় খুব উপভোগ করতাম! আর আমাদের বড়িতে একটি মাত্র কুকুর আছে। এখানে, চারটি কুকুর আমার বন্ধু হয়ে গেছে এবং তাদের গোসল করার কোনো ভার নেই, না তাদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য! এ ছাড়া দুটি তোতা, কাক এবং খরগোশও এদের সাথে খেলার মজা আর কিছুতে নেই!

আর বাবা! আমাদের বাড়িতে, রাতে জানালা বন্ধ করে, এসি চালু করতে হবে। এখানে আমরা সবাই খোলা আকাশের নিচে ঘুমাতাম। চাঁদের আলো, মৃদু বাতাস আর তারার কম্বল ... এত ভালো ঘুম হতো। আর বাবা! মজার ব্যাপার হল এখানে পুরো পরিবার একসাথে ঘুমায়। সবাই একে অপরের ভালোবাসায় থাকুক। আমাদের বাসায়, আমার রুম আলাদা, দিদির রুম আলাদা আর তোমার রুম আলাদা। কে আসে এবং কখন চলে যায়? সে কখন ঘুমায় এবং কখন জাগে? কী করে বা কী করে না? অন্যদের সম্পর্কে কারো কিছু জানার দরকার নেই। যেন কারো সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে একদিন এই ভাইয়ের জ্বর এল। শরীরটা অত্যন্ত গরম ছিল। সঙ্গে সঙ্গে পুরো

পরিবার জেগে উঠল। যখন সবাই জেগে উঠল, আমিও জেগে উঠলাম। যদি আমি আমার ঘুম হারিয়ে ফেলি, আমি পারিবারিক জীবন কেমন তা বোঝার সুযোগ পেয়েছি! যখন একটি পা টিপতে শুরু করে, তখন একটি মাথা টিপতে থাকে। মাসি তার মাথায় জলের পট্টি লাগিয়ে দিলেন। সত্যি বলছি বাবা! এই সব সেবার কারণে নয়, বরং সেবার সাথে যে ভালোবাসা ও সহানুভূতি ও স্নেহ দেখাচ্ছিল, তার কারণেই ওই ভাইয়ের জ্বর এক ঘণ্টার মধ্যে নেমে গেল। সকাল নাগাদ তিনি পুরোপুরি ফ্রেশ হয়ে গেলেন।

বাবা! একদিন ক্লাসে আমাদের শিক্ষক আমাদের একটি প্রশ্ন করেছিলেন, নিরাময়ের সেরা থেরাপি কোনটি?

কেউ বলেছে—অ্যালোপ্যাথি।

আরেক ছাত্র বলেছে—হোমিওপ্যাথি।

কেউ প্রাকৃতিক চিকিৎসার কথাও বলেছে। প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি।

কিন্তু আমাদের শিক্ষক সব উত্তর প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন—সহানুভূতি এবং আমাদের গুরুজির—এই উত্তর সাক্ষাৎকার দাও বাবা! আমার এখানে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে।

আর হ্যাঁ বাবা, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। প্রতিদিন পুরো পরিবার রাতে ঘুমানোর আগে বসে। দিনের বেলায় নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে—এখানে এবং সেখানে অনেক কিছুই ঘটে। এই জিনিসগুলির মধ্যে একে অপরের প্রতি অনেক ভালোবাসা এবং বিশ্বাস রয়েছে! পুরো পরিবার কি আমাদের বড়িতে এভাবে আধা ঘণ্টা বসে থাকে? হ্যাঁ যখনই সবার প্রিয় টিভি সিরিয়াল চলছে, তখন সবাই টিভির সামনে বসে আছে। কিন্তু সেই সময়টাতেও পুরো পরিবার একসাথে থাকলেও কেউ কারো সাথে কিছু বলে না। কারো মনের কথা বলার, অন্যের মনের কথা শোনার উৎসাহ নেই। হ্যাঁ, আপনাকে সিরিয়ালের চরিত্রগুলি শুনতে হবে। তাদের সুখে সুখী হওয়া এবং তাদের দুঃখ থেকে দুঃখী হওয়া। যেন তারা আমাদের আত্মীয়! (যাইহোক, এখন এভাবে একসাথে বসে থাকা ভালো কিছু নয়। প্রত্যেকের ঘরে আলাদা আলাদা টিভি আছে। যদি একজন মানুষ খোলা মন নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে অনেক উপায়ে এমন অভিজ্ঞতা অবশ্যই ঘটবে যে এমনকী, অতিরিক্ত সম্পদ কোনো আশীর্বাদ নয়, এটি একটি অভিশাপ হয়ে

দাঁড়ায়। অর্থের জোরে, পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সমস্ত জিনিস—আলাদা আলাদা সব সুবিধা এবং বাবা! খাবারের কথা বলি, একটা জিনিস আমাদের ভাগ্যে নেই।

বাবা—কী জিনিস?

ছেলে—বাবা! প্রেম...আমাদের বাড়িতে, চাকররা আমাদের শেফ দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য সামগ্রী পরিবেশন করে এবং মাইক্রোওয়েভে গরম করে ফ্রিজে রাখে। এখানে আন্টিজি সবসময় নিজের হাতে গরম খাবার তৈরি করেন এবং নিজে খাওয়ান। তিনি সেই গরম গরম খাবার দিয়ে তার ভালোবাসাও পরিবেশন করেন। ভালোবাসা কারণে সবকিছু সুস্বাদু দেখায়, ভালোবাসা ছাড়া সবকিছু ফিকে হয়ে যায়। এক যুবক অর্থ উপার্জনের জন্য বিদেশে গিয়েছিল। সে সেখানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করে, অনেক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন, কিন্তু পুণ্য তাকে সমর্থন করেনি। বেচারা টাকা না পেয়ে ফিরে এল। যদিও তিনি কিছু উপার্জন না করেই ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু কাকে মা বলা হয়? পুত্রকে সাদরে গ্রহণ করলেন। অনেকদিন পর ছেলে ফিরে এসেছে। মায়ের উৎসাহ ছিল সীমাহীন। বাজারে গেল আম বা কলা কেনার শক্তি ছিল না। সে একটি শসা কিনেছে। আমি আমার ছেলেকে খাওয়াতে থাকলাম। ছেলেও সমান আনন্দে খেতে থাকল। এখন শেষ সত্য? হ্যাঁ যা মা মুখে দিল। কিন্তু এটা কী? শসা এত শক্ত! ওহ ছেলে তুমি কিছু বলোনি? এই শসা কত কঠিন? মায়ের এই কথার উপর, ছেলে হেসে বলল, মা শসা তেতো ছিল, কিন্তু হাত ও হৃদয় কতটা মিষ্টি ছিল যা তাকে সেবা করেছিল! তাহলে কীভাবে একটি শসা তেতো হতে পারে?

এবং বাবা! আমাদের শহরে দুধের প্যাকেট পাওয়া যায় এবং প্রতিদিন দুবারই এখানে তাজা দুধ পাওয়া যায়! দেখুন সাত দিনে আমি কতটা লাল টম্যাটোর মতো হয়ে গেছি।

পিতা! তুমি সাত দিন এখানে থেকে দারুণ কাজ করেছ। অন্যথায় আমি কখনওই বুঝতে পারতাম না যে আমরা কতটা দরিদ্র, আমরা পরিবারহীন এবং একাকী, এমনকী যখন আমরা পরিবারের সাথে থাকি। শুধুমাত্র যদি! আমিও এমন ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করতাম!

অতি ধনী মানুষের জীবনে পারিবারিক জীবন এবং ভালবাসার সম্পূর্ণ

অভাব, বিভিন্ন ব্যবসার কারণে খাওয়া দাওয়া এবং ঘুমের অনিয়ম এবং তাই শারীরিক স্বাস্থ্যেরও প্রায় অভাব ... ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান লোভের কারণে ক্রমাগত উদ্বেগ এবং লোভী নতুন অ্যাডভেঞ্চার যদি থাকে যে কোনো একটি ক্ষতি, তারপর হৃদয় যেমন একটি শক অনুভব। যে মন পুরোপুরি বিপর্যস্ত, টেনশন ... বিষণ্ণতা এরকম অনেক সমস্যা। এবং সুখ কী? শত কোটি টাকা, দেড়শো কোটি এবং দেড়শো কোটি বেড়ে দুইশো কোটি হয়ে গেল। এই সংখ্যাগুলি দেখে কেবল আনন্দ বৃদ্ধি পায় এবং তারপরে এগুলি সমস্ত গোপন রাখার দুর্দান্ত উদ্বেগ! বলা হয় যে ভারতীয় রাজনীতিবিদ, অভিনেতা, ব্যবসায়ী যারা ক্রিকেট খেলেছেন তাদের সুইস ব্যাংকে পঁচাত্তর লক্ষ কোটি টাকা জমা আছে, তাই না! সংখ্যা দেখে খুশি হোন। তা ছাড়া, সেই মালিকরা নিশ্চয়ই এই সম্পত্তি থেকে কোনো বিশেষ আনন্দ পেয়েছেন?

প্রশ্ন: আপনার যদি সম্পত্তি থাকে তাহলে আপনি আশীর্বাদ পেতে পারেন, তাই না?

উত্তর: অহো ভ্রান্তিঃ! বিষ দিয়ে জীবন নাকি মৃত্যু?

সভা—মৃত্যু।

প্রশ্ন: কিন্তু একজন ডাক্তারের দেওয়া বিষ জীবনদাতা হয়ে উঠতে পারে, তাই না?

সভা—করা যেতে পারে ... কিন্তু এরকম একটি গল্প হাজারে একটি হয়ে যায়, বাকি হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে পড়ে। এবং যারা এক বা দুটি বেঁচে আছে তাদেরও এই বিষয়টি ডাক্তার দ্বারা সংস্কার হয়েছে, এই কারণে। অতএব, বিষের ফলাফল জীবন নয়, মৃত্যু।

ঠিক তেমনি, যারা সম্পদের মাধ্যমে পুণ্য করে তারাও বিরল। অধিকাংশ মানুষই পাপী। এমনকী, যারা দয়াময় তাদের জীবনে সাধারণত অর্থের দ্বারা আশীর্বাদ করা ব্যক্তিদের চেয়ে বেশি পাপ থাকে। আরে! অন্যান্য লোকদের সম্পর্কে কী করবেন? মানুষের নিজের জীবন সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত যে সম্পদ বৃদ্ধির পরের, আমার জীবনে পুণ্যের কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে, না কি পাপে?

যদি জীবনের জন্য যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি আয় বন্ধ করা হয়, তাহলে আমার জীবন থেকে কতগুলি পাপও হ্রাস করা যেতে পারে? সত্যতা নিয়ে এটি চিন্তা করলে, এটি স্পষ্টভাবে দেখা যাবে যে সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে

দিন-রাত চার-চতুর্থাংশ হারে পাপ বৃদ্ধি পায়। অতএব, আমরা যেভাবে এই ধরনের জিনিসকে জীবনের সফর বলব, ঠিক সেভাবেই, যদি আপনার টাকা থাকে, তাহলে আপনি খুশি হবেন ... এটিও একটি সফর, আপনার এটি কোনো সন্দেহ ছাড়াই গ্রহণ করা উচিত।

বাস্তবে আমরা আমাদের মূল কথায় ফিরে আসব। দীর্ঘায়িত সঙ্গীত রাজার ঘুমকে ব্যাহত করে। রাজা বিছানাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো না যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি?

শয্যাপালক—রাজন! আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, এই জিনিসটি আমার মনে ছিল কিন্তু ...

রাজা—কিন্তু কী...?

শয্যাপালক—আম সুরেলা সঙ্গীত শুনতে প্রলুব্ধ হয়েছি...

এটা শুনে রাজার রাগের সীমা ছিল না। ''দুষ্ট! আমার আদেশ কি গুরুত্বপূর্ণ, না কি তোমার শোনা? এখন আমি তোমার কথা শোনা বন্ধ করি। এই বলে, ক্রুদ্ধ রাজা চাকরের কানে জ্বলন্ত সীসা ঢেলে দিলেন ...। এটা কার জীবন ছিল? ভগবান মহাবীরের ভবিষ্যৎ তীর্থঙ্কর... তাই কর্মসত্তা তীর্থঙ্করের আত্মাকে লাঠি দেবে, তাই না? ''যদিও তুমি অপরাধ করেছ। কিন্তু আপনি ঈশ্বর হতে যাচ্ছেন...যান, আপনাকে শাস্তি দেওয়া হবে না।'' সমান?

না।

তাহলে গণধর ছাড়বেন?

না।

তাহলে দেবতারা? ইন্দ্রদের কাছে? রাজাদের কাছে? শ্রীমন্ত এবং গুরুজন?

না, কর্মক্ষমতা কাউকে ছেড়ে যায় না।

না, আমি মনে করি কাজের শক্তি অবশ্যই একজন মানুষকে রেখে গেছে...

উনি কে?

তুমি তোমার দ্বারা...।

স্যার স্যার! কেন এমন কল্পনা?

আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলি। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের মন্ত্রীদের গর্বিত ছেলেরা, বড় বড় কর্মকর্তাদের অহংকারী ছেলেরা নির্দ্বিধায় অপকর্ম

করে। কেন? কারণ ‘‘আমার বাবা একজন মন্ত্রী, তাই আমি শাস্তি পাব না’’ তিনি হাসলেন।

হ্যাঁ এটা ঠিক।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে পাপ সে-ই করে যার শাস্তির ভয় নেই। সময় টিভির সামনে বসে গেল ... ব্যবসায়ের প্রতিটি ধাপে বিশ্বাসঘাতকতা, মায়া, প্রতারণা-প্রপঞ্চ। কারণ পেয়েছি এবং রেগে গিয়েছি। যখন আমি আপনাকে এতটা নিশ্চিততার সাথে পাপ করতে দেখছি, তখন আমি অনুভব করি যে ‘‘কর্মসত্তা নিশ্চয়ই তাদের কাছে মাসির মতো মনে হয়েছে, তাই তারা তাদের কোনোভাবেই শাস্তি দেবে না।’’ এটা আমার কল্পনা। অন্যথায়, কর্ম-সত্তা কারও কাজে আসে না। এমনকী, তিনি ভগবান বীরকে বলেছিলেন—আপনি একজন ভাল তীর্থঙ্কর হতে চলেছেন, কিন্তু আপনি যে অপরাধ করেছেন তার শাস্তি আপনাকে ভোগ করতে হবে, প্রস্তুত থাকুন। আর প্রভুর কানে-পেরেক পোঁতা হয়েছিল। আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই, আপনাকে সঠিক উত্তর দিতে হবে।

ভগবান মহাবীরের কানে পেরেক ঠোকা হয়েছিল, কারণ—(১) প্রথম বিকল্প—ভগবান মহাবীরের কাজ ছিল মন্দ, (২) দ্বিতীয় বিকল্প—পেরেকের হাতুড়ি ছিল মন্দ। কোন বিকল্পটি সঠিক? কৌন বনেগা ক্রোড়পতি এই গেম শোতে, অমিতাভ বচ্চন কোটিপতি হয়ে গেলেন। চ্যানেলওয়ালা কোটিপতি হয়ে গেল। আপনার মধ্যে কে একজন কোটিপতি হয়ে গেলেন? প্রকৃতির এই গেম শোও এই পৃথিবীতে চলে।

এই ধরনের প্রশ্নগুলিও প্রকৃতি দ্বারা আমাদের সামনে রাখা হয়। সঠিক উত্তরের জন্য শুধু কোটি কোটি টাকা নয়, আমরা কল্পনাও করতে পারি না যে প্রকৃতি আমাদের এত বড় পুরস্কার দেয়। এসো, এখন উত্তর দাও, —ভগবান মহাবীরের কানে পেরেক ঠোকা হয়েছিল, কারণ (১) প্রথম বিকল্প—ভগবান মহাবীরের কাজ দুষ্ট ছিল। (২) দ্বিতীয় বিকল্প—পেরেক বাছাইকারী ছিল দুষ্ট।

‘প্রথম বিকল্প ছিল ঈশ্বরের দুষ্ট।’ ‘এটা কি সবার উত্তর?’

হ্যাঁ।

লক করা হবে? করতে হবে...?

আপনার উত্তর সম্পূর্ণ সঠিক। কিন্তু এখন, আমি আপনার জীবন সম্পর্কিত

একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি। তোমার আদরের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এক বছর পর সে তোমার বাড়িতে চার দিনের জন্য এসে তার শাশুড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শুরু করে।

এই পৃথিবীতে এমন একটি চরিত্র আছে যার নাম শাশুড়ি, যার সম্পর্কে গুজরাটি ভাষায় বলা হয়—জে রোজ পডাবে আঁশু এনাম নাম সাসু...। (যখন আমি বক্তৃতায় এই কথা বলি, যেসব মায়েরা শাশুড়ি হয়েছেন তাঁরা এর বিরোধিতা করেন। তাঁরা বলেন স্যার, এই সময়ে এটা উল্টো। তাই এখন এই সংজ্ঞাটি পরিবর্তন করতে হবে জে রোজ পাডে আঁশু এনাম নাম সাসু—ঠিক আছে?)

ঠিক আছে।

তাই এখন আমি এই মায়েদের কাছে একটি প্রশ্ন করব, আপনি কি প্রতিদিন চোখের জল ফেলতে চান?

মায়েরা: না...

তাহলে তোমরা শাশুড়ি হয়ো না।

কিন্তু যদি ছেলে হয়?

ছেলেকে আমাদের হাতে তুলে দিন। বিতর্কের মূল রূপে 'শাশুড়ি' উপাধি পাওয়ার চেয়ে 'রত্নগর্ভা মাতা' উপাধি পাওয়া বেশি কাম্য। এই পোস্টটি মহিমান্বিত, এটি উপভোগ্য। যারা এতে বিশ্বাস করে না, তাদের উচিত সেই সব মায়েদের জরিপ করা, যারা এক ছেলেকে বিয়ে করেছে এবং নিজে শাশুড়ি হয়েছে এবং অন্য ছেলেকে সংযমের পথে পাঠিয়ে রত্নগর্ভা মাও হয়েছে। এরকম অনেক সুশ্রাবিকা আজ শ্রী সংঘে উপস্থিত।

তোমার মেয়ে অভিযোগ করছে, মা! বাবা! আমার দুঃখের কোনো সীমা নেই। আমার শাশুড়ি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করা। ঝাড়ু, মোছামুছি, কাপড় ধোয়া, বাসন পরিষ্কার করা, ঘরে খাবার রান্না করা। আমাকে শান্তিপূর্ণভাবে খেতে দেন না, পান করতে দেন না, অথবা শান্তিতে ঘুমাতে দেন না এবং সারা দিন মাঝে মাঝেই সময়ে তিনি কটু কথা বলে যুদ্ধ করে চলেন। বাবা, আমি পুরোপুরি হতবাক হয়ে গেছি...

এখন আমাকে আপনি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। তোমার মেয়ে তার

শাশুড়িকে নিয়ে খুব চিন্তিত। কারণ—(১) প্রথম বিকল্প: আপনার মেয়ের কাজ খারাপ। (২) দ্বিতীয় বিকল্প: মেয়ের শাশুড়ি দুষ্ট।

আমাকে বলুন, কোন বিকল্পটি সঠিক?

"প্রথম বিকল্প...মেয়ের কর্ম দুষ্ট।"

তুমি কি শুধু আমার সামনে এই কথা বলবে নাকি তুমি বাড়ি গিয়ে তোমার মেয়েকেও বলবে? আপনি কি কন্যাকে বুঝাতে পারেন যে, কন্যা! দুষ্ট তোমার শাশুড়ি নয়, দুষ্ট তোমার অতীতে অর্জিত কর্ম! এই উত্তরটি সঠিক এবং এই উত্তরের জন্য প্রকৃতি একটি বড় পুরস্কার দেয়। এই বিষয়ে আমাদের আরও একটি বিষয় বুঝতে হবে যে, কৌন বনেগা ক্রোড়পতি গেম শোতে সঠিক উত্তরের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ভুল উত্তরের জন্য কোনো শাস্তি ছিল না। প্রকৃতির এই গেম শোতে সঠিক উত্তরের জন্য পুরস্কার যতটা মহৎ, ভুল উত্তরের শাস্তি সমান ভয়াবহ। এই পুরস্কার ও শাস্তি দুটোই আমাদের কল্পনার বাইরে। আমরা এই বিষয়টি আরও বিবেচনা করব। এই উদাহরণটি কেবল কন্যার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এটি সবার জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। যখন কিছু সহ্য করার কথা আসে, তখন তা লজ্জাজনক হয়ে ওঠে। প্রতিবেশীরা সমস্যায় জর্জরিত, ধাপে ধাপে তাদের কষ্ট দিচ্ছে। ছোটভাই আমাদের বিরুদ্ধে, পাড়ায়, সমাজে এবং বাজারে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, সে আমাদের সম্পর্কে অনেক বাজে কথা বলে আমাদের বিরুদ্ধে সবাইকে বিভ্রান্ত করছে। যার কারণে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়।

পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে যা সহ্য করতে হয়। X, Y বা Z এরকম অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় অনেকের কারণে, কখনও কখনও একজনের কারণে অনেক কিছু ভোগ করতে হয়। যখনই এইরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়, নিজেকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করুন A-আমি X, Y বা Z-এর কারণে বিরক্ত হচ্ছি কারণ (১) বিকল্প 1 : আমার কাজ খারাপ (২) বিকল্প 2 : এটি X, Y, অথবা Z হল মন্দ প্রতিবার প্রথম বিকল্পটি সঠিক। প্রকৃতি এই উত্তরের জন্য দুর্দান্ত পুরস্কার দেয় কারণ তারা X, Y বা Z কারাগার। জেলারে উচিত বন্দিকে অন্ধকারতম কক্ষে আটকে রাখা, তাকে চাবুক দিয়ে মারা, বিভিন্ন ধরনে কঠিন কাজ দেওয়া, তাকে ক্ষুধার্ত রাখা। আরে! যদি আদালত থেকে আদেশ করা হয়, এমনকী ফাঁসির মঞ্চে ঝোলানো হলেও বাস্তবে সে মন্দ নয়। এটা

তার নিজের অপরাধ যার ফলে তার এর জন্য এই ধরনের শাস্তি হয়। প্রতিটি গল্পে একই ঘটনা ঘটে। এই মন্ত্রটি প্রতিবার জপ করা উচিত ''আমার কর্ম মন্দ ... আমার কর্ম মন্দ ...'' শাস্তির মেয়াদ বা কঠোরতা হ্রাস করার একমাত্র উপায় এটি। ভগবান বীরের সাড়ে বারো বছরের সাধনার সময়কালে, প্রতিটি পদক্ষেপে গুরুতর উপসর্গ রয়েছে, কিন্তু ঈশ্বরের গুণী ব্যক্তিও কোন উপসর্গকর্তাকে মন্দ বলে মনে করেছেন? সে সঙ্গম হোক বা শূলপাণি হোক, কথা পুত্তবন্তী হোক বা গোয়ালা হোক বা অন্য যেকোনো: এই উপসর্গবার্তাগুলির কাউকেই প্রভু মন্দ বলে মনে করেন না এবং এই কারণে তিনি তার প্রতি বিদ্বেষ বা অনিষ্ট থেকে রক্ষা পান। ''আমার কাজ খারাপ। আমি আমার অপরাধের জন্য শাস্তি পাচ্ছি। এই এক্স, ওয়াই অথবা জেড কারাগার। শুধু তাদের সহ্য করলেই আমার শাস্তি বাতিল হয়ে যাবে।'' এই ধরনের চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি করে, এটা নিশ্চিত, অতএব, আত্মা অসহায় মনে হওয়া আঘাত সহ্য করতে পারে এবং তারপর প্রকৃতিও সমানভাবে সহ্য করার জন্য মহৎ শৌর্যকে পুরস্কৃত না করে থাকে না।

যারা ক্ষার এবং বিপদের যন্ত্রণা বহন করে তাদের পা পরিষ্কার এবং উজ্জ্বলতার পুরস্কার পায়। সে সোনা আগুনে পুড়ে যায় সে শুদ্ধি ও উজ্জ্বলতার বর পায়। একজন ভাস্করের হাতুড়ি ছাড়া, দুটি পাথর বহনকারী একটি পাথর ঐশ্বরিক এবং বিশ্ব-পূজিত হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে।

জীবের সত্তার ক্ষেত্রেও একই জিনিস প্রযোজ্য যেমন জড় উপাদানের ক্ষেত্রে। অন্তকাল থেকে কোথাও একটি ঘটনাও দেখা যায়নি, যদি জীবনে যারা যন্ত্রণা সহ্য করে তাদের উপর থেকে পুরস্কৃত এবং শাস্তি না দেওয়া হয়। এর বিপরীতে, যে ব্যক্তি ব্যথা দিয়েছে তাকে আক্রমণকারী ব্যক্তি শাস্তির বস্তুতে পরিণত হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন: যদি আমাদের কোনো ধরনের দোষ না থাকে, তবুও যদি একজন ব্যক্তি প্রতি পদে পদে আমাদের অপমান করে থাকে, তাহলে তা চরম অন্যায়, তাই না? কতদিন আমি এই ধরনের অন্যায় সহ্য করতে পারি?

উত্তর: আমরা কি ন্যায়বিচার বা সমাধানের ব্যাপারে আগ্রহী? ন্যায়বিচারের ফলস্বরূপ, যার পক্ষে রায় দেওয়া হয়, তার ঘরে আলো থাকে, যখন সমাধানে ফলে উভয় ঘরেই আনন্দের প্রদীপ জ্বলে, হতাশা ও দুঃখের অন্ধকার ধ্বংস

হয়। কর্মসত্তা ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী। ত্রিপিস্থ বাসুদেবের বাড়িতে, বিছানা-রক্ষীর কানে গরম সীসা ঢেলে দেওয়া হয়েছিল, শেষ বাড়িতে, কর্মসত্তা কানে ব্যথা দিয়ে ন্যায়বিচার করেছিলেন। কিন্তু ধর্মসত্তা সামাধানের ব্যাপারে বিশ্বাসী। ভগবান মহাবীর—এটা আমার আগের অপরাধের শাস্তি—সেই অসহ্য যন্ত্রণার সমাধান করে, তিনি এটাও অসহনীয় সমতা সহ্য করেছিলেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, কর্মসত্তা আত্মাকে কষ্ট দিতে বিশ্বাস করে এবং ধর্মসত্তা আত্মাকে সুখী করতে বিশ্বাস করে। এখন কি আমরা আমাদের পছন্দ মত পাশে বসতে হবে না, আমাদের উচিত নয়?

সত্য হলো প্রকৃতির নিয়মে অন্যায়ের কোনো স্থান নেই। আমাকে কি সব সময় সহ্য করতে হয়? এই প্রশ্নটি নিজেই অনুপযুক্ত। এখানে, এই কারারক্ষী কখনও অন্ধকার কক্ষে বন্দি থাকে না, হত্যাও করে না বা শ্রমও করে না। কেন আমাকে এই সব যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে? কোনো বন্দি যদি এমন প্রশ্ন করে তাহলে কি এটা ন্যায্য হবে? নস্টারের ব্যথা নাকি সার্জারি। আমার কি এটা সহ্য করতে হবে? যদি আপনি নালি বন্ধ করে দেন, তাহলে কিছুতেই সহ্য করা যায় না। রোগীর কি এমন প্রশ্ন করার অধিকার আছে? যদি কর্মের গিঁট বা বিস্ফোরণ চলে যাচ্ছে, তাহলে এমন প্রশ্ন করার অর্থ কী? যে পাঁচশত শিষ্য পালককে এমন প্রশ্ন করার অর্থ কী? যে পাঁচশত শিষ্য পালককে এমন একজন কারারক্ষী বা শল্যচিকিৎসক হিসেবে গণ্য করেছিলেন, তারা যদি ঘানি মধ্যে চূর্ণ হওয়া যন্ত্রণায়ও অন্যায় দেখতে না পান, তাহলে কেবলমাত্র জ্ঞানের আকারে সর্বোচ্চ তামার পুরস্কার পেয়ে মোক্ষ লাভ করুন। কিন্তু তার জুরু খণ্ডকাসুরি এটাকে পালক পিতার প্রতি চরম অন্যায় বলে মনে করতেন, তাই তাকে দুঃখময় জগতে ঘুরে বেড়ানোর জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। আমি ঈশ্বর বালামুনিকে ঘানিতে এভাবে চূর্ণ হতে দেখব না। এজন্য তুমি আমাকে আগে পিষে তারপর এই বালামুনিকে পিষে ফেল। অনেক অনুরোধ করেছে। পালক খন্দক ইউরির সর্বোচ্চ বিরক্তি দিতে চেয়েছিলে। অতএব, তিনি স্পষ্টভাবে তাদের অনুরোধ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং প্রথম বালামুনিকে ঘানির মধ্যে রাখেন। খন্দক ইউরি মনে মনে ভাবছিলেন: কোনো কারণ ছাড়াই তুমি আমার চারশো নিরানব্বইজন নিরপরাধ সাধুকে তোমার বাটিতে ঢেলে দিয়ে গুঁড়ো করেছ, তবুও আমি একটা কথাও বলিনি। এবং আমি ক্রম পরিবর্তন কার জন্য একটি ছোট অনুরোধ করছি, আপনি কি তা গ্রহণ করেননি? এটা

তোমার চরম অন্যায়। আর এই নাগরিকা, যাঁরা এই চরম অন্যায়কে সাক্ষী হিসেবে দেখছেন, তাঁরাও অন্যায় বন্ধ না করে অন্যায় করছেন।

যদি অন্যায় দেখা যায় তাহলে মন তা সহ্য করতে প্রস্তুত হবে না। এবং তবুও যদি সে সেই অন্যায় বন্ধ করতে না পারে, যদি তাকে অসহায়, বাধ্য হয়েও সহ্য করতে হয়, তাহলে মন প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত হবে। খন্দক সুরির মানসিক অবস্থা এমনই ছিল। এই দুষ্ট অভিভাবক, যে রাজা তাকে এইরকম নিষ্ঠুর কাজ করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন এবং এই লোকেরা যারা তাকে নিষেধ না করে এই অন্যায়কে সমর্থন করে, তাদের এই সমস্ত নিয়ানা* দিয়ে এই শহরের ধ্বংসকারী হওয়া উচিত।

কার্লিয়া... কিন্তু ফলাফল? প্রকৃতি থেকে পুরস্কার বা শাস্তি...? এটি একটি বিশ্ব বিখ্যাত জিনিস...

সঙ্গমদেব এক রাতে ভগবান বীরের কাছে বিশটি ভয়ঙ্কর উপসর্গ তৈরি করেছিলেন। এর পরেও, তিনি তাদের তাড়া করতে থাকেন। ছয় মাস ধরে, তিনি প্রভুর কাছে বিভিন্ন উপায়ে ব্যথা আনার চেষ্টা চালিয়ে যান। তা সত্ত্বেও, প্রভু এটাকে অন্যায় মনে করেননি। প্রভুর কি কোনো ক্ষতি হয়েছিল? একটা কথা মনে রাখতে হবে। এই কর্মসত্তা যেমন শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত নির্দয়, তেমনি ক্ষমা করার ব্যাপারেও সমান দয়াবান। যদি আমরা আমাদের একটি অপরাধের শাস্তি সমানভাবে সহ্য করি, তাহলে এই কর্মসত্তা আমাদের অন্যান্য অনেক অপরাধের শাস্তি ক্ষমা করে দেয়।

কারারক্ষী বন্দিকে প্রতিদিন কঠোরের থেকেও কঠোর পরিশ্রম করায় তার ওপর চাবুকও মারে। বন্দি তাকে দেওয়া প্রতিটি কাজ একজন বাধ্য চাকরের মতো করে। কিলটিও নীরবে সহ্য করে। এই ক্রম প্রতিদিন চলে। যদি কেউ কারাগারে এই ঘটনাগুলো ঘটতে দেখেন, তাহলে তিনি এতে কারাগারের অন্যায় দেখতে পারেন। কিন্তু যে ব্যক্তি কারাগার থেকে চোখ বের করে এবং বন্দির অপরাধ এবং আদালত কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তির দিকে চোখ তুলে নেয়, তখন সে জেলরের অন্যায়কে সামান্যতম হলেও দেখতে পাবে না, সে কেবল এবং

---

* আজ পর্যন্ত করা তপস্যা ইত্যাদির ফলস্বরূপ, আমি ভবিষ্যতে কিছু শক্তিশালী শক্তি-সমৃদ্ধি পেতে পারি, একে নিয়ানা বলা হয়...

শুধুমাত্র দেখতে পাবে বিচার। বর্তমান বিষয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আমার উপর ভয়াবহ অন্যায় করা হচ্ছে। যে কেউ অভিযোগকারী, তার বোঝা উচিত যে বর্তমান জীবন কারাগারের একটি রূপ। স্বীকারোক্তি, আপনি এই কারাগারে কিছু ভুল করেননি। কিন্তু আপনার দৃষ্টিকে এই কারাগারে সীমাবদ্ধ না করে, এই কারাগারের বাইরে, পূর্ববর্তী জন্ম, তাদের মধ্যে সংঘটিত অপরাধ, কর্মসত্তার আদালতের দেওয়া শাস্তি ... এই সমস্ত বিষয়ে চোখ রাখুন, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি কোথাও অন্যায় দেখতে পারেন না, এমনকী একটি ভগ্নাংশও। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং যদি ন্যায়বিচার উপলব্ধি হয়, তাহলে মন অবশ্যই সেই শাস্তি ভোগ করতে প্রস্তুত হবে। শুধু তাই নয়, শাস্তি ভোগ করার পরেও সেই মন সম্পূর্ণ শান্ত থাকতে হবে।

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা এখন এই ন্যায়বিচার গ্রহণ করছেন। এই সম্পর্কিত কিছু জিনিস দেখুন। ড. আলেকজান্ডার আর কেনান, যিনি সম্মোহিত ট্রান্স-হিপনোসিস, মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক হাজারেরও বেশি মানুষে প্রাক-জীব চর্চা করেছেন, তার দ্য পাওয়ার ভাইডন বইয়ে দেওয়া সারাংশ: আপনার পছন্ত অনুযায়ী দ্বিতীয় জন্ম কী? বয়স প্রত্যাবর্তন—এই প্রশ্নের উত্তর না? আমি মিরনায় আছি দ্বিতীয় জন্ম আপনার ইচ্ছানুযায়ী পাওয়া যায় না, কিন্তু আপনার বর্তমান জীবন অনুযায়ী।

পূর্ববর্তী নামে চর্চা প্রকৃতির রাজ্যে চর্চিত সর্বোত্তম ন্যায়বিচাকে প্রমাণ করে, পূর্ববর্তী জন্মে করা যে কোনো অনিষ্টের ফলে কর্ম-প্রতিক্রিয়ার আইন অনুসারে একজন ব্যক্তি কীভাবে এই জন্মে অসুখী হয়ে ওঠে তা বলে। কেন আমার উপর একের পর এক আপত্তি আসতে থাকে? অতীতের মানুষের কাছে নম্রতা যারা এই ধরনের অভিযোগ করে। আমি দশটি পড়ে জানি যে সে পূর্ব জন্মগুলিতে ভুল কাজ করেছে। যখন অন্য ব্যক্তি কিছু করে, তখনও সে সফল। এটি শুধুমাত্র প্রাপ্ত হয়। এটি আগে করা কিছু ভাল কাজের জন্য একটি পুরস্কার হতে পারে।

প্যারাসাইকোলজিক্যাল রিভিশনের মাধ্যমে কর্ম এবং পুনর্জন্মের উপলব্ধির কারণে, পশ্চিমি বিশ্বে কর্ম এবং পুনর্জন্মের তত্ত্ব গ্রহণ করার দাবি রয়েছে। ড. পল ব্রুন্টন তাঁর 'দ্য হিডেন টিচিং বিয়ন্ড ইয়োগা' বইয়ে লিখেছেন যে, কর্মসংস্থান একটি বৈজ্ঞানিক নীতি। এশিয়ার ধর্মগুলো এটা মেনে নিয়েছে। ইউরোপে এর আগেও এটি স্বীকৃত ছিল। কিন্তু এর পরে, প্রায় পাঁচশত বছর

পরে, কনস্ট্যান্টিনোপলের কাউন্সিল তাকে যিশুর শিক্ষা থেকে বহিষ্কার করেছিল এভাবে কিছু অজ্ঞ লোক পশ্চিম দেশগুলোকে এই বৈজ্ঞানিক নিয়ম থেকে বঞ্চিত করে। কিন্তু এখন সময় এসেছে এই বৈজ্ঞানিক নীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার। এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া শাসক, চাকর, শিক্ষক এবং ধর্মীয় নেতাদের কর্তব্য। যখন একজন মানুষ বুঝতে পারে যে তার প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া এড়ানো সম্ভব নয়, তখন সে তার করণীয় সম্পর্কে আরও সতর্ক থাকবে এবং চিন্তা করার সময় আরও সতর্ক থাকবে। যখন তিনি জানতে পারবেন যে ''দ্বেষ এবং ধিক্কার এমন ধ্বংসকারী যে তারা কেবল তাদের যারা আক্রমণ করেছে, শুধু সেই শত্রুকেই নয়, সেখানে ধাক্কা খেয়ে, পিছনে ফিরে সে নিজেই লাঠি বহনকারী ব্যক্তিকে আহত করে'' তারপর তিনি তার মনের মধ্যে এই অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক পাপের চিন্তা করার অনুমতি দেওয়ার আগে একশো বার চিন্তা করবেন।

এই বোঝাপড়া থেকে, একটি কঠিন নৈতিক জীবন বেরিয়ে আসবে। পশ্চিমিদের জন্য পুনর্জন্ম এবং কর্মের নীতিগুলি গ্রহণ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তাও খুব শীঘ্রই, কারণ এই সত্যটি ক) মানুষ এবং দেশের নিজস্ব নৈতিক দায়িত্ব। নিশ্চিত করুন যে সে কোনো অযৌক্তিক বা স্বীকৃতি দেবে না।

যে ব্যক্তি প্রকৃতির এই ন্যায়বিচারকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে, তার জীবনে কোনো অভিযোগ না করে, সে একটি সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ জীবনকে সহজ করে তুলবে। তারপর, 'আমাকে অনেক কাজ করতে হবে এবং সে কিছুই করে না' এই ধরনের জীবটি কোনো অভিযোগ ছাড়াই জীবনের সমস্ত বৈষম্য গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। সাধারণ কারাদণ্ডে দণ্ডিত একজন বন্দি কোনো শ্রমসাধ্য কাজ করে না। একজন মানুষ যাকে কঠিন কারাদণ্ড দেওয়া হয়, কাজ করার সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তবু তার কি কোনো প্রতিশোধ আছে...? বাস্তবে...

যে কন্যা আপনার শাশুড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তাকে বলুন যদি আপনি প্রকৃতির কাছ থেকে একটি মহৎ পুরস্কার পেতে চান, তাহলে আমার কাজগুলো মন্দ, বলুন, সঠিক উত্তরটি ভাবুন। এবং যদি আপনি শাস্তি না চান, তাহলে 'আমার শাশুড়ি খারাপ' এর মতো ভুল উত্তর সম্পর্কে চিন্তা করবেন না।

প্রশ্ন: কিন্তু আমাদের মেয়ে যদি আনুগত্য না করে, কাজে খুব আগ্রহী না হয়, অলস হয়, যে একটু কাজ করে, তার মূর্খতার কারণে তাকে নষ্ট করে, সিদ্ধান্তহীনতার কারণে সে তার শাশুড়িকে ফিরিয়ে দেয় এবং এইগুলি যদি শাশুড়ি আমাদের মেয়েকে সব কিছুর কারণে কষ্ট দিচ্ছেন, তখন আমরা বুঝতে পারি যে শাশুড়ি মন্দ নয়, কিন্তু আমাদের মেয়ে যদি বাধ্য, আবেগপ্রবণ এবং গৃহস্থালির কাজের ব্যাপারে উৎসাহী, দক্ষ এবং একই সঙ্গে এত নম্র হয় যে সে তার শাশুড়ির সামনে কখনও একটি শব্দও উচ্চারণ করে না এবং তার শাশুড়ি তাকে বিরক্ত করে, তাহলে না কেউ বুঝতে পারে হয়তো শাশুড়ি খারাপ এবং কীভাবে এই ধরনের কাকতালীয়ভাবে 'শাশুড়ি খারাপ না' বলতে পারেন?

(এটি অনেক মানুষের জীবনে ঘটে। এর নিজস্ব কোনো ভুল নেই। যদি সামনের ব্যক্তির কল্পনা অনস্বীকার্যভাবে ভুল হয় বা যদি সে জন্য দৃষ্টিকোণ থেকে মন্দ হয়, এবং তাকে বারবার কষ্ট দেয়, তাহলে কীভাবে এমন মনকে বোঝান যে সে মন্দ নয়? আপনি আপনার সমস্ত শরীর, মন এবং সম্পদ ব্যয় করেছেন, যার জন্য আপনি এত কষ্ট করেছেন, আপনি অপমানের তিক্ত পর্দা পান করেছেন, আপনি আপনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজকে অবহেলা করেছেন, একই ব্যক্তি এমন সব কাকতালীয় পরিস্থিতিতে আপনাকে সব ভাবেই কষ্ট দিচ্ছে সে কীভাবে একজন মানুষ এমন হৃদয়কে গ্রহণ করতে পারে যা মন্দ নয়?)

উত্তর: জেলর কখনও খারাপ হয় না। বলার অর্থ এই যে, কারাগার বন্দিকে যত পরিশ্রমই করান না—যাও, এত পাথর ভেঙে দাও, এত শস্য পিষে দাও পুরো কারাগারটি ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করো।

প্রতিবার কোনো যুক্তি ছাড়াই, বন্দি একজন বাধ্য চাকরের মতো সব কাজ করে, চুপচাপ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়, তবুও প্রতিদিন সেই বন্দি কঠোর পরিশ্রম করে এবং উপরন্তু সব মার সহ্য করে। একদিন...দুই দিন, এক মাস, অন্য মাস... কেউ কি এই জেলরকে মন্দ বলতে পারে?

'অ' নামের একজন ব্যক্তির কথা কল্পনা করুন। আদালত কী? অপরাধ কী? শাস্তি কী? জেল এবং জেল কী? তিনি এই জিনিসগুলির কোনোটিই জানেন না বা বুঝতে পারেন না। এটা প্রতিদিন দেখে যে এই মানুষটি (জেলর)

সবসময় দরিদ্র মানুষের (বন্দি) সাথে কতটা কাজ করে। এই দরিদ্র মানুষ (বন্দি) কতটা নম্র এবং নির্বোধ! তিনি কোনো প্রশ্ন বা যুক্তি ছাড়াই কাজটি করেন, এবং সন্ধ্যাবেলায়, এই ব্যক্তি একটি চাবুক দিয়ে চাবুক মারেন। সত্যিই এই দরিদ্র মানুষটি খুবই সহজ, পরিশ্রমী এবং নম্র এবং তিনিই সবচেয়ে দুষ্ট, নির্মম চাবুক মারা মানুষ যা তাঁকে এত কষ্ট দেয়...।

যে ব্যক্তি জেল, কারারক্ষী, আদালত ইত্যাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তার অবশ্যই জেলরকে একজন দুষ্ট বলে মনে হবে। কিন্তু যিনি এই বিষয়গুলির সাথে পরিচিত, এই ন্যায়বিচার ব্যবস্থা, কোনো জেলারের মন্দ খুঁজে পায় না। একইভাবে, পূর্ণ জন্মের আদালত, অপরাধ, কর্ম, সেই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি, অনেক জীবিত প্রাণী জেলারের আকারে ... যার কাছে এই সমস্ত বিষয়ে কোনো বোঝাপড়া নেই, সে দুষ্ট, নিষ্ঠুর বলে আবির্ভূত হতে পারে, কিন্তু যিনি এই সমস্ত বিষয়ে সচেতন, যিনি এই পৃথিবীর কাজ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, তিনি নিপীড়িত জেলর হিসাবে উপস্থিত হবেন, তাহলে কীভাবে তাঁর খারাপ লাগবে?

শঙ্কা: এমনটা ঘটেছে যে কর্ম-সত্তার জ্ঞান থাকাও অপরাধের একটি রূপ হয়ে উঠেছিল, কারণ যে এটি বুঝতে পারে না, তার জন্য শিকার একজন কারারক্ষী নয়, সে তাকে একজন জেলরের মতো বিবেচনা করবে না, তাই তার চেষ্টা করা উচিত তাই তার শাস্তি বাড়বে না। কিন্তু যারা এই নিয়মগুলো বুঝবে, তাদের শাস্তি কেবল বৃদ্ধি পাবে, কারণ তাদের অত্যাচারীকে একজন জেলরের মতো বিবেচনা করতে হবে।

সমাধান: অজ্ঞতা একটি অজুহাত নয়। যে জেলরকে কারারক্ষক হিসেবে গ্রহণ করে না এবং এই কারণে তাকে মন্দ মনে করে এবং তাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে, তাকে হত্যা করে, তাহলে কি সেই বন্দির শাস্তি বাড়ানো হবে না? একইভাবে, যে ব্যক্তি কর্ম-সত্তা ইত্যাদি বোঝে না এবং সেই কারণে যে তার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষার সাথে যন্ত্রণা সৃষ্টি করে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে, তাহলে কর্ম-সত্তা সেই অজ্ঞ আত্মাকেও শাস্তি দেয়। তার অজ্ঞতা তাকে বাঁচায় না।

বাবার হাতে সন্তানকে মার খেতে হয়, যেখানে শাস্তি দেখা যায়, আমরা যারা অপরাধের কল্পনা করি, আমরা যে শাস্তি পাচ্ছি তাতে আমাদের অপরাধের কথা চিন্তা করি না, এটা কীভাবে চলতে পারে? আমরা যা করি

সবই পছন্দ নয় এবং এখনও ভোগ করতে হবে শাস্তি এবং যদি এটি শাস্তি হয় তবে অপরাধ অবশ্যই করা হয়েছে। এবং যদি কোনো অপরাধ হয় তাহলে প্রকৃতিতে শাস্তি দেওয়ার জন্য কিছু ব্যবস্থা (আদালত) থাকতে হবে। অন্যথায় অপরাধ এবং অপরাধীরা নিরপেক্ষ হয়ে উঠতে পারে, অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়বে। চুরি, ডাকাতি, মারামারি, হত্যা ইত্যাদি অনেক ধরনের অপরাধ চারিদিকে দেখা যায় এবং যদি প্রকৃতির আদালত থাকে, তাহলে অবশ্যই কিছু জেলর থাকতে হবে যারা তার দ্বারা নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করতে পারে। এই সমস্ত জিনিস দুই আর দুই হয় (2 + 2 = 4) এর মতো স্পষ্ট এবং সোজা। আমরা যদি এতটুকু বোঝার ঝামেলা নাও নিই, তাহলে কেন আমরা সেই কষ্ট ভোগ না করলে সেটা দোষী হয়ে উঠবে না? কীভাবে এই ধরনের অবহেলা আমাদের বাঁচাতে পারে? সুতরাং অজ্ঞতা কোনো প্রতিরক্ষা নয়।

তাই এখন এটা নিশ্চিত হয়ে গেছ যে কারও কর্ম-সত্তার দরবারের জ্ঞান আছে কি না, হয়রানকারী একজন কারাগার, একজন কারারক্ষী ছাড়া আর কিছুই নয় এবং একজন কারারক্ষী কখনও হৃদয় থেকে দুষ্ট হয় না। দুনিয়ার কারাগারের সেই অফিসারও জেলারের কাছে দশটির বদলে এগারোটি চাবুকের ঘা দিতে পারেন এবং তা করে আদালতের আদেশের চেয়ে বেশি শাস্তি দিতে পারেন, কিন্তু কর্মসত্তার চাবুক জেলরের নির্ধারিত শাস্তির একটি ভগ্নাংশও বৃদ্ধি করতে পারে না। কর্মসত্তা যতটুকু শাস্তি নির্ধারিত করেছেন তার শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা তার আছে। এমনকী, তার একটি ভগ্নাংশও বৃদ্ধি করার ক্ষমতা বা শক্তি নেই। তাহলে কীভাবে আমরা এটাকে মন্দ মনে করতে পারি? এর বাইরে আরও একটি বিষয় আছে যে, কারারক্ষীর চেয়ে জেলরের ক্ষমতা বেশি হওয়া উচিত, এরকম কোনো নিয়ম নেই। অনেক কুস্তিগির, শক্তিশালী এবং ভয়ঙ্কর অপরাধীদের তুলনায় অনেক জেলর দুর্বল তবু জেলর হিসাবে, তারা সেই অপরাধীদের বেত্রাঘাত করতে থাকে। আমাদের ভোগান্তির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দেখা যায়।

ব্রহ্মদত্ত চক্রবর্তী! ছ: ব্লকের সম্রাট! চৌদ্দ রত্ন, নতুন নিধান, যোলো হাজার দেবতা তাকে রক্ষা করার জন্য সদা প্রস্তুত। দেহরক্ষীদের কাফেলা কেমন ছিল যখন রাজসওয়ারী তার নিজের রাজধানীতে বেরিয়েছিল? তারপরও জঙ্গলের যে কোনো উপজতিদের লড়াই জুলেলের সঙ্গে তার চোখ উড়িয়ে দেয়। এটা কি সম্ভব? কিন্তু এটা ঘটেনি, এটা সত্য...

এই ধরনের ঘটনা পৃথিবীতে ঘটছে—এমনকী, যদি আমরা একটু চিন্তা করি—তাহলে অবশ্যই এটি ইঙ্গিত করবে যে দুর্বল প্রাণীটি শক্তিশালীকে ব্যথা দেয়, কেবল একজন 'কারারক্ষী' হতে পারে। আদালতের সমর্থন ছাড়া এটি সম্ভব নয়—একজন কারারক্ষী হিসেবে প্রাপ্ত অধিকার ছাড়া।

এজন্যই আমি বলি যে হয়রানি কারাগার এবং কারারক্ষী তার হৃদয়ে কখনও খারাপ হয় না। যদি আদালতের আদেশ থাকে, তাহলে সে অপরাধীকেও ক্রুশে ঝুলিয়ে দিতে পারে, এবং তবুও সে মন্দ নয়, একইভাবে, যদি আদালতের আদেশের আদেশ থাকে, তাহলে একজনও জীবন নিতে পারে। তবুও, তাকে মন্দ মনে করবেন না। অর্থাৎ...

গালাগালি দেয় ... জেলর!

থাপ্পড় মারে ... জেলর!

পদে পদে অসম্মানকারী ... জেলর!

মিথ্যা অভিযোগকারী ... জেলর!

কথায় কথায় আমাদের কথাকে নস্যাৎ করে ... জেলর!

আমাদের সামনেই জিনিস ধ্বংসকারী ... জেলর!

ব্যবসায় বাধা দেন ... কারাগার প্রহরী!

যে আমাদের হাত-পা ভেঙে দেয় ... জেলর!

এটাই, জেলর ... জেলর ... জেলর! একই শব্দ আবৃত্তি করুন। যদি কিছু সহ্য করতে হয়, মনে রাখবেন ... জেলর! একজন ব্যক্তি খুব বিরক্তিকর, বারবার সমস্যা সৃষ্টি করে! আমরা তার এই ধরনের কীর্তিকলাপ দ্বারা বিরক্ত ... আমরা ক্লান্ত এবং এই কারণে তার প্রতি রাগ রয়েছে। প্রতিশোধ নিতে চায়। এটি সম্পর্কে কিছু বা অন্য কিছু করা আবশ্যক, এই ধরনের অনুভূতি মনের মধ্যে জাগে ... এবং কিছু করতে পারে না, তখন মন অস্থির থাকে, খুব অস্থির থাকে। এই ব্যক্তির নাম যাই হোক না কেন... অ, ব বা ক... তার নাম নিলে আমি নিজেকে বলব... হে আত্মা! এই "এ" একজন জেলর, সে দুর্বত্ত নয়। নাকি এই প্রাণী! A মন্দ নয়। তোমার কাজ খারাপ! এই মন্ত্রটি প্রতিদিন 108 বার জপ করুন, কতক্ষণ? যদি না তার প্রতি শত্রুতার অনুভূতি আমাদের মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় ...।

আমি আপনাকে আরও একটি বৈশিষ্ট্য বলি: কৌন বনেগা ক্রোড়পতিতে একটি সঠিক উত্তর পুরস্কার পাওয়ার পর, যদি আপনি একই উত্তর দ্বিতীয়-তৃতীয়বারের জন্য পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন তাহলে পুরস্কার পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রকৃতির এই খেলায়, একই উত্তর যতবার পুনরাবৃত্তি করা হয়, পুরষ্কার দেওয়া হবে, কারণ এটি এবং কেবলমাত্র এটিই একমাত্র সঠিক উত্তর ... প্রতিবেশী হলেন কারাগার। প্রতিবেশীরা মন্দ নয়। আমার কাজগুলো খারাপ। যদি আমার কাজগুলো এরকম না হয়, তাহলে আমার প্রতিবেশী আমার ক্ষতি করতে কী করতে পারে? যখনই আপনি মনে মনে এইরকম চিন্তা করেন বা অন্যের সাথে কথা বলার সময় এই জিনিসটি পুনরাবৃত্তি করেন, তখন প্রকৃতি আপনার অ্যাকাউন্টে পুরস্কার জমা করে রাখে, কারণ আপনার উত্তরগুলি সঠিক এবং বিপরীতভাবে—'প্রতিবেশী একজন দুর্বৃত্ত', দুষ্ট! আমাকে বার বার হয়রানি করে ... ইত্যাদি যতবার আপনি চিন্তা করেন বা কথা বলেন, প্রকৃতি আপনার বরাতে শাস্তি জমা করে কারণ আপনার উত্তরগুলি ভুল।

এর সাথে আরেকটি বিষয়ও বুঝতে হবে যে, পৃথিবীর কোনো কর্তৃপক্ষ, যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা যে কোনো ধনী ব্যক্তি এই ধরনের পুরস্কার প্রদানে সক্ষম নয়, প্রকৃতিতে এরকম মহৎ পুরস্কার দেয়। এবং ঠিক একইভাবে, পৃথিবীর যে কোনো কর্তৃপক্ষ, আদালত বা শত্রু যারা শাস্তি দিতে পারে না, তারা প্রকৃতির দ্বারা এমন ভয়ঙ্কর শাস্তি দিতে পারে। সংক্ষেপে, প্রকৃতির পুরস্কৃত করার শক্তিও অসীম এবং শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতাও অসীম।

এখন প্রকৃতির কাছ থেকে একটি মহৎ পুরস্কার বা ভয়ানক শাস্তির প্রয়োজন? আমাদের সিদ্ধাত নিতে হবে।

সুখং ধর্মাত্ দুখং পাপাত্ সর্বশাস্ত্রষু সংস্থিতি: ...

১৪৪৪টি গ্রন্থের রচয়িতা শ্রী হরিভদ্রসুরি ম.

শাস্ত্রবার্তাসমুচ্চয়নামক নামে একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে

সুখ ধর্মের ফল, দুঃখ পাপের ফল...

পৃথিবীর সব ধর্মগ্রন্থে বলা আছে...

২. কর্মশক্তি

প্রশ্ন। দুনিয়ার কারাগারে অনেক সময় দেখা যায় যে, জেলর উদ্ধত মেজাজের। আদালতের আদেশ ছাড়াই, বন্দির অসহায়তার সুযোগ নিয়ে, কখনও কখনও তাকে দু-চারবার চড় মেরে তার কাজ করিয়ে দেয়। অনুরূপ কিছু প্রতিবেশী এবং অন্যান্য লোকেরা যারা আমাদের বিরক্ত করে — সে ক্ষেত্রে এটি সম্ভব হতে পারে, ঠিক! আমাদের অপরাধ যাই হোক না কেন এবং সেই কারণে কর্মসত্তার দ্বারা কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি, তবুও প্রতিবেশী এবং যে কোনো ব্যক্তি আমাদের হয়রানি করে, এটাও সম্ভব, তাই না! তাই এই ধরনের কাকতালীয় পরিস্থিতিতে, তাকে মন্দ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে?

উত্তর। কর্ম-সত্তা দ্বারা প্রদত্ত নয়, এমন কোনো শাস্তি কোনো জীবের উপর দেওয়া যাবে না। এই নিয়ম চিরকাল আপনার হৃদয়ে রাখা মূল্যবান। অর্থাৎ, এই দুনিয়ায় কেবলমাত্র কর্ম-সত্তারই শাস্তির অধিকার রয়েছে। তা ছাড়া এই অধিকার অন্য কারও নেই। যে কোনো প্রাণীই হোক না কেন, যতই শক্তিশালী হোক না কেন, যতই শ্রীমন্ত হোক বা বুদ্ধিমান হোক, এবং অন্য কোনো প্রাণীকে কষ্ট দিতে চায়—সমস্যা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, কিন্তু যদি কর্মসত্তা সেই অন্য প্রাণীকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে আদেশ দেওয়া হয়নি, এমনকী, সেই মহান শাসক বা শক্তিশালী প্রাণীও তার ক্ষতি করতে পারে না। আঘাট কুমার এর সেরা—উজ্জ্বল উদাহরণ...।

অবন্তীদেশ, একটি বিশাল শহর, সুঘতী নামে একজন রাজা, জ্ঞানগর্ভ নামে একজন রাজকীয় পুরোহিত। যখন রাজ্যসভায় কাজ চলছিল, তখন একজন চাকর এসে রাজপুত্রের কানে কিছু বলল, যা শুনে পুরোহিতের চোখ জ্বলজ্বল করল এবং বিস্ময়ে তার মুখ থেকে এই কথাগুলো বের হয়ে গেল, আপনি কি ভালো বলছেন? এটা সত্যি? এই কথাগুলো শুনে রাজার কৌতূহল জাগল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপারটা কী?

পুরোহিত বললেন, আমার দাসী একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছে। যখন শিশুটি গর্ভে ছিল, তার মায়ের দেখা স্বপ্নগুলি ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে এই শিশুটি ভবিষ্যতে মহান হবে। আজ সেই শিশুটির জন্ম হয়েছে এবং তার অংশে চক্র-ধনুক ইত্যাদি চিহ্ন রয়েছে। এই খবরটি আমাকে এই চাকর দিয়েছিল।

রাজা : তাই এই চক্র ইত্যাদির লক্ষণগুলির অর্থও বলুন।

রাজপুরোহিত : এই শিশুটি এই শহরের রাজা হবে এবং সেটাও আপনার জীবদ্দশায়।

রাজপুরোহিতের প্রতিটি শব্দ রাজার বিবেককে কাঁটার মতো বিঁধতে শুরু করে। আমার প্রিয় পুত্র বিক্রমসিংহ নয় এবং একজন দাসীর ছেলে আমার রাজ্যের রাজা হবে। অসম্ভব! অসম্ভব...! কিন্তু এটাও নিশ্চিত যে, ধনুক এবং চাকা ইত্যাদির মতো চিহ্নই রাজ্য এনে দেয়। এই চিন্তায় রাজার মন ভয় পেয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত রাজা সিদ্ধান্ত নিলেন যে শিশুর মৃত্যুই এর একমাত্র সমাধান।

রাজা আদেশ দিলেন। দুইজন চাকর নবজাতককে রাজপুরোহিতের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল - শুধু তাকে মেরে ফেলার জন্য...। শিশুটিকে তাঁর হাতে নিয়ে তারা শহরের বাইরে চলে গেল। কিন্তু দেবতার মতো একটি নিষ্পাপ শিশুকে দেখে তিনি ভাবতে শুরু করলেন - এত ছোট শিশু। সে রাজার কাছে কী অপরাধ করেছিল যে রাজা তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন? এত সুন্দর ও নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করার জন্য তাঁর বিবেক প্রস্তুত হচ্ছিল না। 'এটাকে এখানে কোথাও রাখি। তখন পশু-পাখিরা যা খুশি তাই করতে পারে।' এই ভেবে শিশুটিকে একটি কূপের কাছে বসিয়ে দুজনেই চলে গেল।

সকালে বাগানে ঢোকার সাথে সাথে মালিটির বিস্ময়ের সীমা ছিল না। এই বাগানটি ছিল জরাজীর্ণ। গাছে খুব কমই একটি বা দুটি ফুল ফোটে। আজ যেন বসন্ত এসেছে। প্রতিটি গাছ ফল ও ফুলে ভরা। এটা কি অলৌকিক ঘটনা চারপাশে তাকানোর সময়, একটি হাস্যোজ্জ্বল শিশু কুয়োর কাছে উপস্থিত হয়েছিল। এমনকী, শত্রুর হৃদয়েও, যার জন্য ভালোবাসা জন্মেছিল, সে বাচ্চাকে দেবতার মতো তুলে নিয়ে চুমু খেতে শুরু করে। তিনি তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যান এবং তার নিঃসন্তান স্ত্রীর হাতে তুলে দেন। আজ থেকে আর কেউ তোমাকে বন্দি বলে ডাকবে না। বাগানে যা শোনা যাচ্ছিল না, আজ এমন একটা ঘটনা ঘটেছে, তাই শিশুটির নাম ছিল অঘাট কুমার।

অবর্ণনীয় আনন্দের সাগরে ডুবে থাকা মালিপত্নী পরম যত্নে সন্তানের যত্ন নিতে শুরু করেন। একদিন তিনি শিশুকে নিয়ে রাজার কাছে ফুলের মালা দিতে দরবারে আসেন। শিশুটিকে দেখার সাথে সাথেই জ্ঞানগর্ভ রাজপুরোহিত জানতে পারেন যে এটি সেই শিশু। তাঁরা জানতেন শিশুটিকে অপহরণ করা হয়েছে। কিন্তু ছেলেটি কোথায় ছিল তা তিনি জানতেন না। আজ যখন সে ছেলেটিকে দেখল, সে তার থেকে চোখ সরাতে পারল না। এটি রাজার নজরে আসে। কারণটি স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করে পুরোহিত বললেন : এই সেই দাসীপুত্র যে আপনার সিংহাসনে বসতে যাচ্ছে। রাজা আবার চিন্তায় ডুবে গেলেন। তিনি তাঁর দুই চাকরকে ডাকলেন। রাজার রাগ দেখে দুজনেই তাদের ভুল স্বীকার করে বলল যে আমরা শিশুটিকে কূপের কাছে রেখেছিলাম। অনুসন্ধানে দেখা গেল, মালি সেই শিশুটিকে কুয়োর কাছ থেকে পেয়েছে। এখন নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে এটি একই শিশু।

এই ছেলেটি রাজা হয়, এটা কোনোভাবেই রাজার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তিনি একটি অত্যন্ত নিষ্ঠুর জল্লাদকে আদেশ দিলেন সেই সন্তানের জীবন শেষ করার জন্য। সৈন্য জোর করে মালির থেকে শিশুটিকে নিয়ে যায়। যমের মতো নির্মম জল্লাদ ছেলেটিকে নিয়ে বনের দিকে রওনা হল। আঘাট কুমার সুদর্শন এবং কৌতুকপূর্ণ এবং প্রফুল্ল ছিলেন। যমের মতো নিষ্ঠুর, এমনকী এই অজানা লোকটির ভয় ছাড়াই, তিনি তার দাড়ি টানতে শুরু করেন এবং তার আধো আধো স্বরে বলতে থাকেন, বা ... বা ... বা ...

যদি দাড়ি টানার কাজটিকে দুষ্ট দুষ্টামি হিসেবে দেখা হয়, তাহলে রাগ প্রেরণায় পরিণত হয় এবং যদি এটি শিশু খেলা হিসেবে দেখা হয়, তাহলে প্রেম প্রেরণায় পরিণত হয়। এটা আরও সম্ভব ছিল যে একজন জল্লাদের মতো নিষ্ঠুর মানুষ, শিশু-হত্যার জন্য প্রস্তুত একজন নিষ্ঠুর মানুষটিকে দুষ্টামি মনে হবে। দুষ্ট! আমার দাড়ির চুল টেনে কি ব্যথা হচ্ছে? আমি কি তোমার বাবা যে বা... বা... বা... বা... করছ? কিন্তু কর্মসত্তা এখনও এই শিশুর মৃত্যুদণ্ড ঠিক করেননি। তিনি শাস্তির পরিবর্তে পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন। অতএব, তিনি এই বেদনাদায়ক খেলায় বাল্যক্রীড়া দেখার জন্য এই কঠোর হৃদয়ের জল্লাদকেও তৈরি করেছিলেন। স্নেহে তার হৃদয় ভরা। আমি কি এমন একটি শিশুকে হত্যা করব যে আমাকে বলছে বাবা ... বাবা? এমন নিরীহ শিশুকে হত্যা করলে আমি কতটা পাপ অনুভব করব? মৃত্যুর পর কোথায় যাব?

তারপর সে ভাবল - কিন্তু যদি আমি এটাকে না মেরে ফেলি তাহলে রাজাজ্ঞার কী হবে? আমার চাকরির কী হবে? যদি রাজা কোথাও জানতে পারেন, তিনি আমাকে তার শিরশ্ছেদ করে পুরস্কৃত করবেন না?

এই বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হয়ে জল্লাদ পৌঁছে গেল বনে। বনে একটি যক্ষ মন্দির ছিল। বড় পেট এবং লম্বা দাড়িওয়ালা প্রতিমা দেখে ছেলেটি খুশি হল। ছোট পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সে মূর্তির কাছে পৌঁছে তার উপরে উঠে গেল। ছেলেটি প্রতিমার দাড়ি নিয়ে খেলা শুরু করে। জল্লাদ এই দেখে এবং নিজে পালিয়ে যায়, শিশুটিকে হত্যা করার পাপ থেকে বাঁচতে শিশুটিকে সেখানে রেখে যায়। অন্ধকার বনে একা থাকা সত্ত্বেও ছেলে আঘাট কুমার তার খেলায় ব্যস্ত।

পুণ্যবান দুর্ভাগা মানুষেরা না ঘুমিয়েও অনেক রাত কাটায়, তবুও তারা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে পারে না, এমনকী ভূতরাও ভাগ্যবানদের সব কাজ করে। এজন্যই জ্ঞানীরা বলেন - 'পাপ করা বন্ধ করো, যতটুকু পুণ্য সঞ্চয় করতে পারো তা পূরণ করো। তাহলে আপনাকে নিজের সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে না। তোমার দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক হোক।' সাধারণত, দেবতারা তাঁদের জগতে সুখী। হাজার বছর পেরিয়ে গেলেও তাঁরা পৃথিবীতে অবস্থিত তাঁদের নিজস্ব মন্দিরের দিকে মনোযোগ দেন না। কিন্তু আঘাট কুমার তো যোগ্যতায় পূর্ণ। প্রকৃতিকে তাঁর সেবা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়েছিল। সেই যক্ষ (দেব) অবধির জ্ঞান নিয়ে বালক অঘাটকে তাঁর মন্দিরে একা দেখেছিলেন।

অঘাট কুমারের এই দৃষ্টান্তে জল্লাদ আঘাটকে হত্যা করেনি। সে তাকে একা রেখে চলে যায়। অন্যত্র, অন্যান্য দৃষ্টান্তেও এমন একটি জিনিস পাওয়া যায় যে এমনকী, নিজের জীবনের ঝুঁকিতেও জল্লাদ সিদ্ধান্ত নেয় যে, ''আমি শিশুটিকে হত্যা করব না, কিন্তু নিমেষেই তার যত্ন নেব। আমি তাকে রক্ষা করব! এখানে বিবেচনা করার বিষয় হল যে এই ব্যক্তি একজন জল্লাদ, যার হৃদয়ে এমনকী, রহমতের চিহ্নও দেখা যায়নি। যদি কেউ তাকে বলে, হে পাপ! মানুষ হত্যা করতে কাজ করে? মৃত্যুর পর আপনি কোথায় যেতে চান? তারপর তার অবিচল নাস্তিকতা ঘোষণা করে বলতেন, আমি পাপ-পুণ্য-পরকালে বিশ্বাস করি না। এমন নির্দয়, নাস্তিক জল্লাদকে আজ দয়াময় আস্তিক বানিয়ে দিচ্ছে?

কর্ম-সত্তার অযোগ্য শক্তিগুলি বোঝা প্রয়োজন। তিনি বলছেন - ''আমি সবচেয়ে নিষ্ঠুর করতে পারি - নিষ্ঠুর ব্যক্তি দয়ালু। আমি কট্টর নাস্তিককে আস্তিক বানাতে পারি। আমি ভক্ষককে ত্রাণকর্তা বানাতে পারি।'' যেন সে বলছে যে যদি আমি দীর্ঘায়ু উপহার দিতে চাই, আমি কী করতে পারি না? ২০০৭ জুলাই সালের জুলাই মাসে, প্রিন্স নামে একজন শ্রমিক, ছ'বছরের ছেলে, ৩০ ফুট গভীর গর্তে পড়ে যায়। বোরওয়েলের প্রস্থ এত ছোট ছিল যে কোনো উপায়ে এটিকে টেনে তোলা সম্ভব ছিল না। সে কোনো মন্ত্রী, বড় শিল্পপতি বা কোন বড় অফিসারের সন্তান ছিল না। দরিদ্র শ্রমিকের সন্তান! এই দেশে শ্রমিক ও দরিদ্রদের মূল্য কত? এমনকী, যদি পাঁচ-পঁচিশজন মারা যায়, তাহলে কোন দেশবাসী এর জন্য একটু দুঃখ অনুভব করে? ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা, কাফিশালাও কি একই জিনিসের প্রমাণ নয়? এমন উদ্ভট পরিস্থিতিতে আটকা পড়া থেকে বাচ্চাকে কে বাঁচাবে? কিন্তু প্রকৃতি কী? যেন সেই শিশুটিকে বলছি - আমি তোমাকে বাঁচাতে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নামিয়ে আনব। আমি তাদের কাছে একটি অস্বাভাবিক মিশন করিয়ে দেব। আমি লক্ষ লক্ষ টিভি দর্শককে তোমার জন্য প্রার্থনা করতে দেব। সেনাবাহিনীর এই মিশনের মাধ্যমে, ছেলেটি কাছাকাছি পঁয়তাল্লিশ ফুট গভীর কুয়োকে ষাট ফুট গভীর করে এবং একটি পথ তৈরি করে সেই কূপ থেকে বোরওয়েলে, পঞ্চাশ ঘণ্টা পরে ছেলেটিকে বাইরে আনে। তাকে বাঁচিয়ে তোলে।

২০১০ সালের কোনো এক সময় চিলির মাটির দুই হাজার ফুট নিচে খনিতে ত্রিশজন খনি শ্রমিক আটকা পড়েছিলেন! শুধু চিলির দেশ এবং সমগ্র বিশ্বই নয়, শ্রমিকরা নিজেও শুরুতে বেঁচে থাকার আশা দিয়েছিল। কিন্তু কর্মসত্তা তাদের পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। একটি অকল্পনীয় - অভূতপূর্ব অপারেশনের মাধ্যমে সত্তর দিন পর, তাদের সকলেরই পৃথিবীতে সূর্যের দর্শন করে।

প্রকৃতি সমস্ত কিছুর যত্ন নেয়। দুষ্টু আমার পেটে চড়ে বসল! আমার দাড়ি টানছে? আমার জন্য এমন অপমান? ঈশ্বর এরকম কিছু ভেবেছিলেন। বরং ''এই ছেলেটি আমাকে কতটা ভালোবাসে।'' এইরকম একটি চিন্তা তাঁর মনে প্রকৃতি দ্বারা জাগ্রত হয়েছিল এবং সেই কারণেই সেই ঈশ্বর ভেবেছিলেন যে এই শিশুটিকে খুব ভালবাসার সাথে লালনপালন করা উচিত এবং তেমন জায়গায় রাখা উচিত। এই ভাবনা নিয়ে দেবতা নিঃসন্তান স্বার্থবাহ দেওধরকে

স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যে বিপুল সম্পদের মালিক, একই বন প্রদেশে বসবাস করে, এখানে আমার মন্দিরে দেবকুমারের মতো একটি শিশু আছে। তুমি তাকে নিয়ে যাও এবং তাকে পুত্র হিসেবে গড়ে তুলো। দেওধরের আনন্দের সীমা ছিল না। এই উজ্জ্বল শিশুটি পেয়ে তিনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতে শুরু করলেন। দেবতার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা সহকারে, আবেগের সাথে তাঁর পূজা করলেন এবং তাঁর জায়গায় ফিরে এলেন।

দেওধরের স্ত্রী শুধু সন্তানই পাননি, মাতৃত্বও পেয়েছেন। তাঁর সুখের সীমা ছিল না। অসাধারণ বুদ্ধি - প্রতিভা, নম্রতা এবং অনুশীলনের কারণে, সময়ের সাথে সাথে, সেই শিশু তার যৌবনের অভিষেকের সময় সমস্ত অস্ত্র এবং শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেছিল। বাবার সাথে সাথে তিনি ব্যবসার ক্ষেত্রেও দক্ষ হতে শুরু করেন। তার ব্যবসার জন্য ঘোরাঘুরি করার সময় একদিন বিশালা দেওধরের ছেলেকে নিয়ে শহরে পৌঁছে গেল। অতি মূল্যবান পবনভেনী ঘোড়া রাজাকে উপহার দেওয়ার জন্য এবং ব্যবসার অনুমতি পেতে দেওধর পুত্র আঘাট কুমারের সঙ্গে দরবারে পৌঁছেছিলেন। রাজপুরোহিত জ্ঞানগর্ভের চোখ আঘাতে পড়ে এবং তিনি হতবাক হয়ে যান। শরীরের চিহ্ন দেখে তিনি নিশ্চিত হন যে এই আঘাট কুমার। নির্জনে তিনি রাজার সাথে কথা বললেন। রাজা হতবাক হয়ে গেলেন। জল্লাদ থেকে সবকিছু জানলেন। এখন এটা বিশ্বাস করা হয়। এখন কী করতে হবে? বল্লভীমঙ্গের ইতিহাস শাস্ত্রবিধি পাঠে আসে। মারওয়ারের পালি নগরে কাকু আকাত এবং পটক নামে দুই ভাই থাকতেন। ছোট ভাই খুব ধনী এবং বড় ভাই সমান দরিদ্র। কর্মের খেলা দেখুন যে বড় ভাইয়ের ছোটভাইয়ের ক্ষেতে কাজ করার সময় এসেছে। একদিন বড়ভাই ভাই ক্লান্তিতে চিৎকার করে উঠলেন। গভীর ঘুমে, কাকু আককে মধ্যরাতে পটাকা জাগিয়েছিল। বলল, তোমার কি কোনো ইন্দ্রিয় আছে নাকি? মাঠ থেকে জল প্রবাহিত হচ্ছে এবং আপনি এখানে শান্তভাবে ঘুমিয়েছেন? কীভাবে কাজ করা হয়? টাকা উপার্জন করতে হবে, তাই না? উঠে মাঠে গিয়ে কাজ করা। মনকে মেরে ফেলার পর তাকে উঠতে হয় এবং মাঠে যেতে হয়। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর তিনি দেখেন যে মানুষ মাঠে কাজ করছে। সে বিস্মৃত। এই মুখগুলোর কেউই পরিচিত ছিল না। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, মধ্যরাতে আপনারা কারা এভাবে কাজ করছেন?

তারা উত্তর দিল, আমরা আপনার ভাইয়ের গুণ কেনা দাস। এমন উত্তর

শুনে কাকুয়া অনুভব করলেন যে এই মানুষগুলো দেবতা, মানুষ নয়। প্রকৃতির শিল্প দেখুন! কাউকে পুরস্কৃত করার জন্য, সে দেবতাদেরও দাস বানিয়ে দিতে পারে...!

''তুমি বল্লভীপুরে যাও। সেখানে তোমার ভাগ্য প্রকাশিত হবে।'' দীর্ঘ যাত্রাপথে অনেক কষ্ট সহ্য করে কাকুয়াক বল্লভীপুরে পৌঁছান। সেখানে গিয়ে তেল, মরিচ, মশলা ইত্যাদির ব্যবসা শুরু করেন। ধীরে ধীরে ব্যবসায় উন্নতির পর তিনি নিজের একটি ছোট দোকান তৈরি করেন। কাকু আকনম কথা বলতে লোকেদের কষ্ট হতো, তাই সবাই তাকে রাঙ্কা শেঠ বলে ডাকত। এখন তার নাম বিখ্যাত হয়ে গেছে। একদিন গিরনার থেকে এক গালিচা ব্যবসায়ী সেখানে আসেন। গিরনারে বহু সাধনা ও অনুসন্ধানের পর বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এটি এমন একটি রস ছিল যে এমনকী একটি মন (২০ কেজি) লোহাও সোনা হতে পারে। প্রাণের চেয়েও বেশি শ্রম দিয়ে এই রসের অ্যালভিওলি নিয়ে এসেছিল সে। তিনি রাঙ্কা শেঠের দোকানের পাশেই নিজের জায়গা করে নেন। ধীরে ধীরে দুজনে বন্ধুত্ব হয়। সেই দিনগুলিতে সোমনাথের গৌরব শুনে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যাত্রার জন্য। এই যাত্রায় এত মূল্যবান জিনিস নিজের কাছে না রেখে রাঙ্কা শেঠের হাতে তুলে দেওয়ার কথা ভাবলেন। শেঠের কাছে এসে বললেন, ''শেঠজি, আমার এই বাক্সটা আপনি সাবধানে রাখবেন। ভ্রমণ থেকে ফিরে আসার সময় এটি আমাকে দেবেন।''

রাঙ্কা শেঠ সহজভাবে বললেন, ''এই দোকানে এটি রাখুন যেখানে আপনি এটি পছন্দ করেন।'' দোকানের উপরের অংশে সুশৃঙ্খলভাবে আলমারি বেঁধে সে কার্পেটের দিকে রওনা দিল। একদিন কোনো কারণে শেঠ নিজেই দোকানে চুলা জ্বালিয়ে তাওয়া উপরে রাখলেন। গরমের কারণে তাওয়ার উপর এক ফোঁটা রস পড়ে গেল। কালো তাওয়া সোনার হয়ে গেল। রাঙ্কা শেঠ চমকে উঠল। আরেকটি তাওয়া নিয়ে আসুন। ক্রমবর্ধমান উত্তাপের কারণে, তাওয়ায় সোনার দ্বিতীয় ফোঁটা পড়ল এবং এই লোহার তাওয়াটিও সোনালি হয়ে চকচক করতে লাগল। রাঙ্কা শেষ বুঝলেন ওই বাক্সতে সোনা আছে। এখন লোভ প্রাধান্য পেয়েছে। ভাবলেন - ''এখন আমি এই বাক্সটি ফেরত দেব না।'' এবং ভবিষ্যতে কিছু ঝামেলা হবে এই চিন্তায় তিনি তাঁর দোকান থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র বের করে দোকানে আগুন ধরিয়ে দেন। যেন কিছুই

জানেন না এমন ভাবে আগুন আগুন বলে চিৎকার শুরু করেন। লোকজনও চিৎকার শুরু করে। মানুষ জড়ো হয়ে আগুন নিভিয়ে দেয়। পরবর্তীতে শেঠ একটি নতুন দোকান খোলেন। তিনি ইতিমধ্যেই বহু সোনার মালিক হয়েছিলেন। এখন সে বড় শেষ হয়ে গেছে। কিছুদিন পর কার্পটি ভ্রমণ করে ফিরে আসেন। রাঙ্কা শেঠ বড় দুঃখের সঙ্গে বললেন, কী করব মিঞা! হঠাৎ আগুন লেগে যায়। এতে পুরো দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ছোট্ট বাক্সের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কোথায়?

এমন কথা শুনে এবং শেঠের সমৃদ্ধি দেখে, তার অতীত এবং আজকের জীবনযাত্রায় আকাশ-জমিনের পার্থক্য দেখে, কার্পটি সবই বুঝতে পারে, কিন্তু সে কীভাবে কিছু বলতে পারে? হঠাৎ তার মনে পড়ল যখন সে সোনালি বাক্সটি ভর্তি করছিল, তখন সে একটা রহস্যময় শব্দ শুনতে পেল - 'ভার রাঙ্কা কে নাম'... একবার সে বাক্স খালি করে দিয়েছিল। আবার যখন সে বাক্স পূরণ করতে শুরু করেছিল, তখন একই শব্দ শোনা গিয়েছিল। 'ভার রাঙ্কার নাম...'

কার্পটি একরকম কাকতালীয়তার সমাধান করেছে, মনকে বুঝিয়ে দিয়েছে - ''এই স্বর্ণ আমার ভাগ্যে ছিল না, রঙ্কাসেঠের ভাগ্যে ছিল। তাই...! যা হয়েছে, তাই হয়েছে। এত বড় ক্ষতি আমরা কত সহজে মেনে নিয়ে রাগ, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার প্রক্রিয়া এড়াতে পারি!

পুরোহিত স্পষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে আঘাটের মা তার গর্ভাবস্থায় দেখেছিলেন এবং নবজাতকের শরীরে দৃশ্যমান লক্ষণ দেখে যে এই শিশুটি রাজা হবে। নিজে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল, তবুও প্রকৃতি তাকে অলৌকিকভাবে রক্ষা করেছে, শুধু তাই নয়, সেই জীর্ণ বাগানটিকে নতুন করে তৈরি করে সে তার গৌরব বাড়িয়েছে। দ্বিতীয়বারের জন্য তাকে একজন অত্যন্ত নিষ্ঠুর জল্লাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, এমনকী তার জীবনকে বাজি রাখার পরও জল্লাদ নিজেই তাকে রক্ষা করেছিল, আমার আদেশও অমান্য করেছিল।

রাজা সুগত সব জেনেও আঘাটকে রাজা করার প্রকৃতির সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারতেন। ''ঠিক আছে! যদি এটা তার ভাগ্যে থাকে, এমনকী যদি সে রাজা হয়। ''কিন্তু এটাই ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য - (প্রকৃতির কাছে)'' এই

সত্যকে মেনে নিতে তাঁর মন প্রস্তুত ছিল না। আমি রাজা, আমি শাসক। আমি যা পছন্দ করি না, আমি তা কখনওই হতে দেব না - এমনই ছিল তাঁর আদর্শ এবং এর কারণে হেরে যাওয়া জুয়াড়ি যেভাবে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে খেলে, ঠিক সেভাবেই রাজা আঘাটকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলার জন্য নতুন কৌশল খুঁজতে শুরু করেন। ''আমার এই আঘাটের খুব দরকার, যে বিজ্ঞানে পারদর্শী'' ইত্যাদি দেওধরকে বোঝানোর পর, আঘাট কুমারকে তাঁর কাছে রাখলেন। মথুরা প্রদেশের প্রশাসনের তত্ত্বাবধানের জন্য তাকে মথুরার জনগণের দ্বারা আঘাটকে একটি দুর্দান্ত স্বাগত জানানো হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য দক্ষ কর্মকর্তা ও শক্তিশালী সৈনিক থাকা খুবই প্রয়োজন। তিনি এরকম এক হাজার মানুষকে তাঁর জন্মভূমি থেকে ডেকে এনে তাদের জায়গায় নিয়োগ দেন। এখন তিনি মথুরার সম্রাট হন এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার যত্ন নিতে শুরু করেন। রাজা সুঘাট এই খবরে খুব মর্মাহত হলেন। এখন কীভাবে তার জীবন শেষ করবেন? তিনি একটি কৌশল খুঁজে পেয়েছেন। তিনি আঘাট কুমারকে বিশলা নামে ডাকতেন। প্রিন্স বিক্রমসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করছেন। আপনাকে তার সাহায্যে যেতে হবে। প্রস্তুত হও।

আঘাট কুমার তো খুব খুশি হয়ে উঠল। তার মনে কোনো সন্দেহ নেই। 'মহারাজা', আপনি এই কাজটি অর্পণ করে আমার উপর বড় উপকার করেছেন। কাল সকালেই আমি যাব।

''ঠিক আছে! তুমি প্রস্তুত হও। আমি রাজপুত্রকে চিঠি লিখছি।'' রাজা বললেন।

দ্বিতীয় দিনে, আঘাট তাঁর সেনাবাহিনীর সাথে রাজ্যের সিলমোহর নিয়ে মিছিল করেন। এই চিঠিতে তাকে বিষ দেওয়ার কথা আছে বলে তার কোনো ধারণা নেই। সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে একদিন পুরো সৈন্যদল সেই জঙ্গলে সেই যক্ষের মন্দিরের কাছে পৌঁছে গেল। শৈশবে তিনি এই যক্ষের দাড়ি নিয়ে খেলতেন। এবং এই যক্ষ দেওধরকে স্বপ্নে শিশুটিকে অনুসরণ করতে বলেছিল... আঘাট এর কিছুই জানেন না। তিনি তাঁর বিশেষ গুণের কারণে প্রকৃতির পাওনাদার হিসেবে এসেছেন। প্রকৃতিকে সতর্ক থাকতে হবে। আজ, প্রকৃতি আবার যক্ষের জ্ঞানকে মন্দিরে অবস্থিত এই বনের দিকে ঘুরিয়ে দিল। দেব আঘাট কুমারকে উদাসীনতার সাথে দেখেছিলেন এবং তাকে চিনতে

পেরেছিলেন। অধিজ্ঞানের শক্তিতে তিনি চিঠিতে লেখা বার্তার কথা জানতে পারলেন এবং তাঁর দৈবশক্তি দিয়ে একই স্বাক্ষরে বার্তাটি পরিবর্তন করে লিখলেন—যে এই চিঠি এনেছে তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হওয়া উচিত।

আঘাট তার সেনাবাহিনী নিয়ে কুমার বিক্রমসিংহের কাছে পৌঁছলেন। রাজার চিঠি বিক্রমসিংহকে হাতে বেশি সময় নেই বলে দেওয়া হয়েছিল। রাজার স্বাক্ষর এবং রাজমুদ্রার সঙ্গে লেখা চিঠি নিয়ে সন্দেহের জায়গা কোথায়? জোশিকে জিজ্ঞাসা করার পর, তিনি কাছেই সেরা সময় বলেছিলেন। বাবা নিশ্চয়ই সেখানে সেরা সময় নিক পেয়েছেন এবং হাতে বেশি সময় নেই বলে সেখানে রাজকুমারীকে কাছেই ডাকা অসম্ভব মনে করে, বাবা অবশ্যই অবিলম্বে বিয়ে করার জন্য এমন একটি ধারণা লিখেছেন। আর আঘাট কুমারের বিয়ে হয়ে গেল। সুঘট রাজা যখন এই খবর পেলেন, তখন তিনি অনুভব করলেন যেন তিনি স্ট্রোকের শিকার হয়েছেন। এর পরেও তিনি কোনো জ্ঞানার্জন করতে প্রস্তুত নন। এখন তারা নতুন কৌশল অবলম্বন করতে রাজি হয়েছেন আঘাটকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে। এই কৌশলের ফলে নিজের মেয়ের সৌভাগ্য ভেঙে গেলেও! রাজা বিশালকে আসার জন্য আঘাটকে আমন্ত্রণ পাঠালেন। আঘাট অবাক হলেন। কোথায় যুদ্ধের ব্যাপার আর কোথায় বিয়ে আর এখন বিশাল শহরের দিকে যাত্রা! তিনি নববিবাহিত স্ত্রী এবং শ্যালক বিক্রমসিংহ প্রমুখকে নিয়ে বিশালায় পৌঁছেছিলেন। রাজা ও প্রজারা তাদের সবাইকে অভ্যর্থনা জানালেন। রাজা নির্জনে আঘাটকে বললেন, তুমি বিয়ে করেছ, কিন্তু একটা পদ্ধতি বাকি আছে। আঘাত জিজ্ঞেস করল - কী?

আগামীকাল, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর রাতে, কুলদেবীর জন্য নৈবেদ্য অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। আঘাট উপাচারের জন্য যেতে রাজি হলেন। নৈবেদ্য প্রস্তুত করার পাশাপাশি রাজা হত্যাকারীদেরও প্রস্তুত করেছিলেন। "যে মধ্যরাতে নৈবেদ্যের প্লেট নিয়ে আসবে, তাকে খতম করে দেবে।" এমন কঠিন পরামর্শ দিয়েছেন। চতুর্দশীর রাত এল। এই বিদায়কে শেষ বিদায় মনে করে রাজা আঘাটকে বিদায় দিলেন। পূজার সামগ্রী এবং নৈবেদ্যের থালা নিয়ে আঘাটে বার হলেন। বাইরে যেতেই তার সঙ্গে বিক্রমসিংহের দেখা। তিনি আঘটকে জিজ্ঞাসা করলেন - এই সময় কোথায় যাচ্ছ? অঘাট পুরোটা খুলে বলল।

বিক্রমসিংহ বললেন, ''ভগ্নিপতি! মন্দির অনেক দূরে। রাস্তা ভাল না। অন্ধকার ঘন। আপনি এই জায়গাটির সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত। যদি আপনি ঠিকভাবে পূজা পদ্ধতি সম্পূর্ণ করতে চান, তাহলে আমাকে উপাসনার উপাদান দিন। আমি বহুবার সেই মন্দিরে গিয়েছি। রাস্তাও আমার পরিচিত। আমি সেখানে গিয়ে নৈবেদ্যকে কুলদেবীর সামনে রাখব। এই কথা শুনে কুমারের হাতে পূজাসামগ্রী দিয়ে দিলেন আঘাট। রাজপুত্র মন্দিরে পৌঁছলেন এবং সেই খুনিদের ছোঁড়া তির তাঁর শরীরে বিঁধল।

রাজা সকালে খবর পেলেন। তিনি প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত ধাক্কা রাজার চিন্তার দিকটাই বদলে দিল। তাঁর অনুতাপের সীমা ছিল না। ''কপালের লিখন কে খণ্ডাতে পারে?'' এখন তিনি এই চিরন্তন সত্যকে মেনে নিলেন। ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য এবং নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তিনটি আঘাট কুমারের কাছে রাজ্য হস্তান্তর করেছিলেন এবং নিজেই অবসরের পথ গ্রহণ করেছিলেন। কঠোর পরিশ্রম করে তিনি জ্ঞান অর্জন করেন। একবার বেড়াতে গিয়ে বিশালা শহরে এলেন। রাজা আঘাট এলেন পূজা করতে। সবাই ভক্তির অমৃত পান করলেন। অবশেষে রাজা তাঁর মনের মধ্যে জড়িয়ে থাকা প্রশ্নের সমাধান করতে বললেন, প্রভু! কেন আমার জীবনে উত্থান-পতন হয়েছে?

আঘাট কুমারের প্রশ্নের উত্তরে শুধুমাত্র ভগবন্ত খুলে দিলেন অতীতের আবরণ...!

বিদর্ভ দেশ, কুণ্ডিনাপুর নগর, পুরন্দর রাজা, রাজকুমার গজভঞ্জন। ... একদিন বাগানে খেলার সময় কুমার তপস্বী মুনিরাজকে দেখলেন। তপস্যা দেখানোর বদলে কুমারের চোখ গেল মুনিরাজের নোংরা কাপড়চোপড়ের ওপর এবং মনে ঘেন্নার অনুভূতি জাগল ... 'এমন নোংরা ঋষি! কত নোংরা...!' অপরাধের শাস্তি হিসেবে দাসীর গর্ভে জন্ম নিতে হবে...। কিন্তু কুমারের বন্ধু ছিলেন আবেগপ্রবণ। তিনি ঋষির চরণে পূজা করে বসলেন। কুমারও তাঁর সঙ্গে বসলেন। মহাত্মা অহিংসা ও করুণার গুরুত্ব শিখিয়েছিলেন, যা কুমারের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। তিনি শপথ নিয়েছিলেন - 'আমি কখনও নিরীহ জীবকে হত্যা করব না।' একমাস উপোস থাকা সেই মহাত্মার সেবা করার সুবিধাও তিনি নিয়েছিলেন।

তখনকার দিনে নবরাত্রির সময় মহিষ হত্যার প্রথা চলছিল। রাজা পুরন্দর কুমার গজভঞ্জনকে আদেশ দিলেন - ''এবার তোমাকে মহিষ বলি দিতে হবে। এই তলোয়ারটা নাও।'' কুমার দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন। একদিকে অঙ্গীকার, অন্যদিকে ডিক্রি। রাজার বারবার বলায় তরবারি উঠল, কিন্তু ব্রত পালনের চিন্তা আসতেই মাঝপথে তরবারি থেমে গেল। আবার রাজার সংকেত, আবার তলোয়ার তুলে আঘাত করার চেষ্টা করলেও মহিষের ঘাড়ের কাছে এসে তলোয়ারটি থেমে যায়। এরকম চারবার হয়েছে। এ কারণেই আঘাটকে হত্যার চারবার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং প্রতিবারই প্রচেষ্টা বৃথা গেছে। শেষ পর্যন্ত গজভঞ্জন রাজাকে বললেন, ''একে মারতে পারলাম না। আমার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য যদি আমাকে আমার জীবন দিতে হয় তবে আমিও তা দেব।'' এবং সারা জীবন তিনি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন।

পূর্বজন্মের কথা শুনে আঘাট জাতপাতের জ্ঞান লাভ করেন। এখন তিনি তার আত্মাকে বৈষম্যের রঙে রাঙিয়েছেন, সংযম নিয়েছেন এবং কেবলজ্ঞান অর্জন করে মোক্ষলাভ করেছেন।

এ থেকে বোঝা যায় যে, কর্মসত্তার আদালত যদি শাস্তি নির্ধারণ না করে থাকে - তাহলে রাজার মতো শাসক যতই চেষ্টা করুক না কে, সে তার ইচ্ছানুযায়ী শাস্তি দিতে পারে না। আরে! উল্টো তার শাস্তি দেওয়ার সেই একই প্রচেষ্টা সেই প্রাণীর গ্র্যান্ড পুরস্কার প্রদানকারী হয়ে ওঠে। ভালো করতে গিয়ে কর্মসত্তার পাওনাদার হয়ে থাকাটা কি মজার বলে মনে হয় না?

একই জিনিসের আরেকটি দৃষ্টান্ত হল ময়নাসুন্দরী!

ময়নার বাবা গর্বিত ছিলেন যে আমি যাকে চাই খুশি করতে পারি এবং যাকে চাই দুঃখী করতে পারি। কিন্তু কর্মসত্তায় পূর্ণ বিশ্বাসী ময়না বাবার কথা মানেন না। তিনি বলেছেন : ''কর্মের দ্বারা যা ঘটে, তা ঘটে।'' তাই এখন তার বাবা রাজা প্রজাপাল মনে করেন : এই ময়না আমার ক্ষমতাকে অবমূল্যায়ন করে... তাই এখন আমাকেও দেখান আমি তাকে কতটা দুঃখ করতে পারি এবং যে আমার কথা মেনে নেয় তাকে কতটা খুশি করতে পারি। ''এইরকম চিন্তাভাবনা বিবেচনা করে, ক্রুদ্ধ রাজা সুরসুন্দরীকে অরিদামন নামের এক রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন, যিনি তাকে পছন্দ করেছিলেন। ময়না সুন্দরীকে রাজা বিয়ে দিয়েছিলেন উম্বর রানা নামে এক কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে। কিন্তু কর্মসত্তার যা করার কথা ছিল তা হয়নি।

রাজা কুষ্ঠরোগীকে বিয়ে করে ময়নার জীবন নষ্ট করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কর্মসত্তা তাকে কোনোভাবেই শাস্তি দিতে চাননি। কর্মসত্তা ময়নাকে পুরস্কৃত করতে চেয়েছিলেন। অতএব কর্মায়ত্ত উম্বর রানা রূপে সর্বাধিক সৌভাগ্যবান গুণী শ্রীপালকুম্বর পাঠিয়েছিলেন। তাকে বিয়ে করে ময়না সুখী ছিল না, এখন খুব সুখী হলো। যদিও কর্মসত্তা সুরসন্দরীকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। ভাগ্যবান বিবেচনা করে, যার সাথে তিনি বিয়ে করেছিলেন তিনি ছিলেন রাজকুমার কাপুরুষ হয়ে ওঠে এবং সুরসুন্দরীকে জীবিকানির্বাহের জন্য নর্তকী হতে হয়েছিল।

আমাদের এই একটি চিরন্তর সত্যকে আমাদের মানসিকতায় দৃঢ়ভাবে চিহ্নিত করতে হবে - আমাদের বিবেকে যে কর্মসত্তা যখন পুরস্কৃত করতে চায় - শাস্তি নয়, তখন যে কোনও মানুষ তাকে কষ্ট দিতে সক্ষম, এমনকী, সে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেও, এমনকী সে ক্ষতি করতে পারে না। তার এর অর্থ খুবই স্পষ্ট যে, কোন জীবেরই কাউকে কষ্ট দেওয়ার ক্ষমতা নেই এবং যখন এমন কোন ক্ষমতা নেই, যে কোন জীবিত সত্তা (কারারক্ষক) যতই চায় বা চেষ্টা করুক, যা কর্মের শক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয়নি, যেমন না কেউ শাস্তি দিতে পারে।

অতএব, বিশ্ব কারাগারের কারারক্ষী কখনও কখনও নির্দিষ্ট শাস্তির চেয়ে বেশি যন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারে, প্রকৃতির আদালত, বন্দি স্বেচ্ছায় নির্ধারিত শাস্তির একটি ভগ্নাংশও বৃদ্ধি করতে পারে না, সে কিছু পরিবর্তন করতে পারে না। এবং যদি ব্যক্তি শাস্তি দিতে চায়, তাহলে একজন ব্যক্তি যতই ব্যবস্থা করুক না কেন, তারপরও সে সেই শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না। এই জাতীয় সংমিশ্রণে, এমনকী, রক্ষকও ভক্ষক হয়ে উঠতে পারে।

ইন্দিরা গান্ধীকে কে হত্যা করেছিল? তাঁর দেহরক্ষীরা নিজেরাই, তাই না? ইন্দিরাজীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি শক্তিশালী ছিল না? তাঁর বাড়ি দিল্লির সফদারগঞ্জ মার্গে। তাঁদের নিরাপত্তার জন্য, সেখান থেকে সাধারণ যানবাহনের যাতায়াত অনুমোদিত নয়। সবাই অন্যদিকে ঘুরছে। যদি কোনো সন্ত্রাসী কোথাও বোমা বিস্ফোরণ করে।

এ ছাড়া তাঁর দেহরক্ষী প্রতি সপ্তাহে রিহার্সাল করতেন। হঠাৎ কোথাও থেকে কোনো সন্ত্রাসী এলে প্রধানমন্ত্রীকে রক্ষা করবেন কীভাবে? যদি সে গুলি চালাতে শুরু করে, তাহলে প্রধানমন্ত্রীকে তার শরীরে গুলি বহন করেও

বাঁচানো উচিত। এই মহড়ার সময় তারা যে দ্রুততা এবং তৎপরতা প্রদর্শন করেছিল তার কোনোটাই প্রকৃতপক্ষে দেখাতে পারেনি যখন হত্যা করা হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের পিছনে ২৪ ঘণ্টা অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখা থাকে। হত্যার দিনও একটি অ্যাম্বুলেন্স ছিল, কিন্তু এর চালক বা কারও কাছে এর চাবি ছিল না। এ কারণে তাঁকে অ্যাম্বাসেডর গাড়িতে নিয়ে যেতে হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সঙ্গে ওয়্যারলেস যোগাযোগ ছিল AIIMS - অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস, দিল্লির হাসপাতাল যেখানে ভিআইপিদের চিকিৎসা করা হয়। এখানে কিছু ঘটলে, অবিলম্বে হাসপাতালে একটি বার্তা পাঠানো যেত। কিন্তু ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে - ম্যান সাপোজেস গড ডিসপোজেস। মানুষ অনেক পরিকল্পনা করে কিন্তু ঈশ্বর সেই পরিকল্পনাগুলিকে উল্টে দেন - সেগুলো নষ্ট করে দেন ... এটা পশ্চিমের উক্তি। আমরা তাই বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর কখনো কারও বাজি উল্টে দেন না, নষ্ট করেন না। খেলার উন্নতির জন্য। আমরা তাই বলি - ম্যান সাপোজেস, কর্মসত্তা, ডিসপোজেস ... মানুষ পরিকল্পনা করে, কর্মশক্তি তাদের বিপরীত করে দেয়।

প্রায় কুড়ি বছরের যুবক বিয়ে করে সুখী জীবন যাপনের ইচ্ছা। বাবা-মা চার-ছয়টি পরিবার দেখেছেন। একটা মেয়েকে পছন্দ করেন। তাকে চেনেন এমন অনেকের কাছ থেকে তার সম্পর্কে তথ্য পেয়েছেন। সবার কাছ থেকে ভালো রিভিউ পাওয়ার পর তিনি ওই মেয়েকে বিয়ে করেন। বছরগুলো শান্তিপূর্ণভাবে কেটে গেল। কিন্তু পরবর্তীতে মৌলিক প্রকৃতি প্রকাশ পেতে থাকে। একেবারে পিতল! এমন ঝগড়াটে, সুযোগ পাওয়া মাত্রই পুরো বাড়ি মাথায় করত। দরিদ্র স্বামী অত্যন্ত সাবধান হয়ে গেল। স্ত্রীর কাছে এমন কোনো যন্ত্র পাওয়া যায় না এবং এর সম্পূর্ণ যত্ন নেয়। কিছু বলার আগে, করার আগে দশবার ভাবেন তার ফল কী হবে? তারপরও তার স্ত্রী... কিছু অজুহাত খুঁজে বের করে, সে লড়াই শুরু করে। জীবন কঠিন হয়ে পড়েছে। স্বামী মনে করে - অন্যরা তো শান্ত, স্নেহময়ী বউ পেয়েছে আর আমার এমন ঝগড়াটে বউ কেন? আমার গলায় এমন ফাঁস কেন?

পনেরোটি পশুর মধ্যে একটি পশুর গলায় লাঠি বাঁধলে দোষ কাঠের নয়,

পশুর। একইভাবে ঝগড়ুটে বউ হলে কার দোষ হবে? হ্যাঁ, একমাত্র স্বামীর। যিনি কাঁকড়ার মতো বউ পেয়েছেন তাঁকে বুঝুন।

আগের জন্মে তাঁর স্বৈরাচারী ছিল বোধহয়। কারও নিয়ন্ত্রণে থাকতে না। প্রকৃতি ভাবল - যদি নিয়ন্ত্রণ করতেই হয়, তাহলে গলায় একটা কাঠ বেঁধে দিতে এই কাঠ বেঁধে দেওয়া হল। সুখী জীবনযাপনের সমস্ত কল্পনা প্রকৃতি দ্বারা, কর্ম দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

স্ত্রী একটি ঝগড়ুটে বা খুব অদ্ভুত প্রকৃতির বা সন্দেহজনক বা স্বামী খুব গুরুতর প্রকৃতির বা মদ্যপ। সারাদিন বাসায় থাকে, কোনো কাজ করে না। যে কোনো কারণে, স্বামী বা স্ত্রী, যারা এইরকম কোনো কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাদের স্বামী বা স্ত্রীর অপরাধবোধে ব্যথিত না হয়ে আমার আগের জন্মের অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছে।

এভাবে চিন্তা করে পরিস্থিতিকে মেনে নিতে হবে, যা মনকে শান্ত করতে সাহায্য করবে এবং জীবনসঙ্গীর প্রতি ঘৃণা ও ঘৃণার অনুভূতি থেকে দূরে থেকে নতুন পাপ এড়ানো যাবে। এই পয়েন্টটি মানুষের সাপোজের, কর্মসত্তারও সাপোজেস।

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য হাসপাতালের সাথে ওয়্যারলেস মেসেজিংয়ের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু কর্মসত্তা কাকে বলা হয়? মানুষের তৈরি সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে তার কত সময় লাগতে পারে? ইন্দিরাজির হত্যার দিন সেই বেতার বার্তার অবনতি হয়েছিল। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরই এই দুর্ঘটনার কথা জানতে পারেন চিকিৎসকরা। ডাক্তাররা আগে থেকে প্রস্তুতির সময়ও পেতে পারেননি।

ইন্দিরাজির রক্তের গ্রুপ ছিল আরএইচ নেগেটিভ। এই গ্রুপের রক্ত সবসময় হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখা হতো, কিন্তু সেদিন এই গ্রুপের রক্ত ছিল না।

স্টেনগান দ্বারা ইন্দিরাজির শরীরে ত্রিশটি গুলি ছুড়ে দেওয়া সতবন্ত সিং এবং বিয়ন্ত সিংকে সরকার ইন্দিরাজির কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নিযুক্ত করেছিল এবং তাঁর সুরক্ষার জন্য। এমনকী তাদের স্টেনগানের যে গুলি ভরা ছিল তা ওঁর সুরক্ষার জন্যই দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু কর্মফল যখন নষ্ট হয়, তখন রক্ষকও ভক্ষক হয়ে যায়।

একজন মানুষের ব্যবস্থা যাই হোক না কেন, সে অনুকূল পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করে, কিন্তু যদি কর্মের ক্ষমতা শাস্তি দিতে চায়, তাহলে কর্মের ক্ষমতা মানুষের পুরো ব্যবস্থাকেই ফলহীন করে দিতে পারে। এটি এমনকী, একটি একক অনুগ্রহকে এমন প্রতিকূলতায় রূপান্তরিত করতে পারে বা একটি সম্পূর্ণ নতুন পরিবর্তনকে এমনভাবে প্রবর্তন করতে পারে যে শেষ পর্যন্ত এটি জীবের জন্য একটি শাস্তি হয়ে ওঠে। ধর্মগ্রন্থে এমন অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে।

৩. সাজানোর উপায়...

একটি শহরে বাস করত এক বিধবা বোন, তার দুই ভাই এবং দুই শ্যালিকা... পাঁচজনের একটি পরিবার। ভাই-বোনের মধ্যে বোনের প্রতি অনেক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল, তবুও এক নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি, বোনের মনে সন্দেহ জাগল-আজ সবার মনেই ভালোবাসা আছে, কিন্তু আগামিকালের কী হবে? আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে না? সুতরাং, এটি পরীক্ষা করুন এবং দেখুন।

একদিন বাইরে থেকে বড় ভাইকে আসতে দেখে ভাই এমনভাবে শুনতে পেল যে, বোন জামাইকে বলল, তুমি সবসময় হাত পরিষ্কার রাখো। বোনের কথা শুনে ভাই ভাবল, ''আমার বোন আমার স্ত্রীকে এমন শিক্ষা দিচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই আমার স্ত্রী কিছু চুরি করেছে।'' সে তার স্ত্রীর সাথে কথা বলা বন্ধ করে, তার আচরণ কমিয়ে দেয়। কিছুদিনের মধ্যেই বউ উঠে তার ননদের সাথে কথা বলে। বোন সবকিছু বুঝতে পেরে তার ভাইকে বলল, ''আপনি কল্পনা করুন, এরকম কিছু নেই। আমি কেবল শিক্ষা দিচ্ছিলাম যে কেউ যেন চুরি না করার ব্যাপারে সতর্ক থাকে। ভাইয়ের মনের সংশয় বোনের দ্বারা স্পষ্টভাবে দূর হয়ে যায় এবং স্ত্রীর সাথে তার আচরণ একই রকম হয়ে যায়। বোনও খুশি ছিল যে ভাই আর বউদির মনে আমার গুরুত্ব আছে।

কিছুদিন পর ছোট ভাই দোকান থেকে আসছিল, যখন সে শুনতে পেলো, বোন ছোট বোনকে বলল, ''তোমার শাড়ির যত্ন নিও!'' ছোট ভাই এটা শুনে ভাবল - ''আমার বোন কেন এমন বলল? নিশ্চয়ই আমার স্ত্রী দুষ্কৃতকারী হবে।'' এই ভেবে তিনি স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। বেচারা স্ত্রী গভীর চিন্তায় পড়ে গেল। অবশেষে কথা হলো তার ভগ্নিপতির সঙ্গে। জামাই উপযুক্ত সুযোগ পেয়ে ছোট ভাইকে বুঝিয়ে বললেন, ''ভাই! আপনার স্ত্রী সতীর মতই পবিত্র। কিন্তু পরপুরুষেরা চিন্তা যেন আমার মনে না আসে, সেজন্যই বলেছিলাম।'' ছোটভাই সন্তুষ্ট হয়ে স্ত্রীর সাথে আগের মতই

ব্যবহার শুরু করে। বোনকেও খুশি ও নিশ্চিত হতে হবে। সবাই আমার সাথে একমত... কিন্তু অজান্তেই, দুই বোনের শ্বশুর-শাশুড়ির বিরুদ্ধে এমন আচরণের অভিযোগ আনা হয়েছিল, তিনি অপরাধটি করেছিলেন। অনেকেই বৈধব্য অবস্থায় পূজা করেছিলেন কিন্তু এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেননি। ...

এখন, আসুন কর্ম-সত্তার শাস্তির পদ্ধতি দেখি। দ্বিতীয় ঘরে, একজন বিধবা বোন একটি শেঠের কন্যা হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। দুই ভাই এক শেঠের দুই ছেলে হয়ে অন্য শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে এক ভাইয়ের সাথে এই শ্রেষ্ঠী কন্যার বিয়ে হয়। বিয়ের প্রথম রাতে আকাশমার্গ দিয়ে যাওয়া এক ব্যান্তরের মজা করার ইচ্ছা হল। বুঝুন যে কর্মসত্তাই তাকে তা করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। সদ্য বিবাহিত শ্রেষ্ঠীকন্যা যেখানে তার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন যেখানে সেই ব্যান্তরদের তার স্বামীর রূপ নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন এবং তার সাথে কথা বলা শুরু করলেন। নববিবাহিতা কন্যা কিছুই জানতেন না। তিনি তাঁকে তাঁর স্বামী হিসাবে বিবেচনা করে প্রেম শুরু করেন। বাইরে থেকে স্ত্রীর কথা শুনে ফেললেন স্বামী। তিনি ভাবলেন, ''বিয়ের প্রথম রাতে আমার স্ত্রী একজন পুরুষের সঙ্গে এভাবে কথা বলছে! নিশ্চয়ই সে একজন স্বৈরিণী .... আমি কীভাবে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি?'' স্ত্রীকে ত্যাগ করে সেখান থেকে চলে যায়। স্ত্রীর বাবা-মাকে বললেন, ''আমি এই বিয়ে মানি না।'' শ্রেষ্ঠীকন্যা খুবই মর্মাহত হন কিন্তু পরে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দীক্ষা নেন। এবার সুন্দর সাধ্বী জীবনযাপন শুরু করলেন।

এখন অন্যদিকে ... এই দুই ভাই আগের জন্মের দুই বোনের সাথে বিয়ে করেছিলেন। সাধ্বীজি মহারাজও একই শহর পরিদর্শন করতে গিয়েছেন। পূর্বাভাবের ভালবাসার কারণে, উভয় স্ত্রীরই তাঁর প্রতি ভালবাসা এবং ভক্তি ছিল। এবং এই কারণে তাঁরা দুজনেই প্রতিদিন তাঁর সেবায় যেতেন। ভিক্ষা করতেন গোচারী। একদিন সাধ্বীজি ভিক্ষা নিতে তাঁর বাড়িতে গেলেন। সেখানে তিনি প্রচার করছিলেন। এমন সময় এক পুত্রবধূ তাঁর গলায় মালা বাইরে রেখে কিছু কাজে ভিতরে গেলেন। সাধ্বীজি বাইরে একা ছিলেন এবং সামনে পড়েছিল। তারপর দেওয়ালে ছবিতে দেখানো ময়ূরটি ছবি থেকে জীবিত বেরিয়ে এসে গলার মালা নিয়ে চলে গেল। (কোনো ভগবান আবার

এটাকে উপহাস করেছিলেন।) এবার নেকলেস চুরির অভিযোগ পড়ল সাধ্বীজির ওপর। গুরুনিও কড়া কথায় বললেন, ‘‘গৃহস্থের বাড়িতে থাকার কী দরকার ছিল? তুমি ওখানে থাকো কেন? এই কলঙ্ক ধুতে এখন সাগারিক উপোস করো...!’’ গুরুনির আদেশ অনুসরণ করে সাধ্বীজি কায়োৎসর্গে দাঁড়িয়েছিলেন। শুভ অনুভূতির স্রোত বৃদ্ধি পায় এবং সাধ্বীজি শুক্লা ধ্যানে আরোহণ করে কেবল জ্ঞান লাভ করেন। লোক জড়ো হল। ঠিক সেই মুহূর্তে ময়ূর এসে গলার মালা সেখানে রাখল। সবাই অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে কেওয়াল জ্ঞানী সাধ্বীজি পূর্বাভবের পুরো কাহিনি সকলের কাছে বর্ণনা করলেন।

গুণসেন ও অগ্নিশর্মার মতো কর্মসত্তার শক্তি সম্পর্কেও একই কথা বলা হয়েছে, তাই না?

অগ্নিশর্মার মৃত্যুর দিন গুণসেন মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা পেলেন কেন? দ্বিতীয়বারও পারানের দিনে-একদিনও এগিয়ে না পিছিয়ে-হঠাৎ যুদ্ধের পরিস্থিতি কেন? নিজের ভুলের কারণে ভীষ্মের তপস্বীর পারান হারিয়ে গেছে। অগ্নিশর্মা তৃতীয় মাসক্ষমণ তপস্যা শুরু করেছেন। তপস্যার সাথে সাথে তাঁর সাম্যও বৃদ্ধি পায়। এই কারণেই গুণসেনের অহংকারও বাড়ছে, ভক্তিও বাড়ছে।

সে যাচ্ছে। দুবার পারনা পরিশোধ করার জন্য তিনি চরম অনুশোচনার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং এই কারণে তিনি পুরোপুরি সতর্ক হয়ে গেছেন যাতে তৃতীয়বারের মতো তাঁকে কোনও কাকতালীয়তায় ভুল না করা হয়। পারানের সুবিধা নেওয়ার যে অভ্যন্তরীণ ইচ্ছা আছে তা নয়, প্রবল ইচ্ছা আছে, এক ধরনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা আছে। ঊনবিংশ দিন... পনেরো দিন... দশ দিন... যাও। এখন মাত্র পাঁচ দিন হয়েছে... এখন তিন... এখন আরও দু’দিনের বিশেষ তথ্য পুরো রাজপরিবারকে দেওয়া হয়েছে যে আগামীকাল যেন কোনোভাবেই ভুল না হয়। আমি সাবধান, তবুও যদি যন্ত্র আসে, তাহলে সবাই আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে আজ আমাকে পারনা করতে হবে। তিনি নিজেও এই কথা বারবার পুনরাবৃত্তি করছেন এবং বারবার এবং বারবার অন্যদের জন্য বারবার বলছেন, তবুও রানি একই দিনে প্রথম পুত্রের জন্ম দেন। ছেলের জন্মের আনন্দে সবাই নাচছিল, আর কার্নিভালে পারনার কথা কেউ মনে রাখেনি।

যাই হোক, যদি আপনি মনে করেন যে কত বড় আনন্দের উৎসব হতে পারে, কিন্তু এত দিন যা মুখস্থ করা হচ্ছে, কেউ মনে করতে পারছে না, এটা কি সম্ভব? কিন্তু কর্মসত্তা কাউকে মনে করতে দেয়নি। আর যে মুহূর্তে অগ্নিশর্মা পাস না করে ফিরে এলেন, তখন গুণসেন পারানের কথা মনে পড়ল।

যে অনেক বোঝার! অগ্নিশর্মা চান পারানা হোক। সমস্ত তাপসও চায় যে কঠোরতা সম্পূর্ণ হোক। উপাচার্যও একই চাচ্ছেন। এটি গুণসেন এবং তাঁর রাজপরিবারের ইচ্ছা এবং তার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে, তবুও গুণসেনের হাতে তা অর্জন করা যায়নি। কেন? কারণ কর্মসত্তা এটা চায়নি এবং কর্মসত্তা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা-ই ঘটে। এবং যাতে কর্মসত্তা যা চেয়েছিল, তাই ঘটতে পারে, যাতে কর্মসত্তা অনেক কাকতালীয় পরিবর্তন করে। অথবা এমন কিছু কাকতালীয়তার জন্ম দেয় যাতে তার ইচ্ছা সফল থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় পারানে শিরোবেদন, যুদ্ধ সংঘটিত এবং তৃতীয় পারানে রাজার পুত্রের জন্ম। প্রতিটা পর্ব পারানের দিনে...! এক দিন আগে বা পরেও নয়! যদি একটু সহানুভূতি এবং চিন্তা করার ক্ষমতা থাকে, তাহলে দেখা যাবে এর পিছনে প্রকৃতির কিছু ইঙ্গিত আছে এবং এটা নিশ্চিত যে প্রকৃতি অগ্নিশর্মাকে শাস্তি দিতে চায়। আন্তরিকভাবে, গুণসেন অগ্নিশর্মাকে পারান করতে চায় এবং তবুও কর্মসত্তা এমন কাকতালীয় ঘটনা উপস্থাপন করেছে যে পারান ঘটতে পারেনি। অতএব, আমাদের বোঝা উচিত যে কোনো জীবই আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কষ্ট দেয় না, স্বেচ্ছায় আমাদের বিরক্ত করে না, কর্মসত্তাই তাকে তা করতে অনুপ্রাণিত করে।

শঙ্কা : এটি গুণসেনের ব্যাপারে সত্য। অন্যথায় সাধারণত সবাই নিজের ইচ্ছায় অন্যকে কষ্ট দেয়। এই বইয়ের অন্য কোথাও কী নিয়ে কথা হচ্ছে, সেই নাগকেতুর আগের অস্তিত্বে, তার সৎ মা স্বেচ্ছায় তাকে ভয়ানক যন্ত্রণা দিয়েছিলেন, তাই না?

সমাধান : হ্যাঁ, এটা ঠিক যে সৎ মায়ের নিজের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সেই ইচ্ছাটাও কর্মসত্তার ফসল, এটা বিশ্বাস করা উচিত। শুভূম চক্রবর্তী ছয়টি ব্লকের রাজত্ব পেয়েছিলেন কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। আমার কাছে চৌদ্দ রত্ন, নব নিধান এবং ছিয়ানব্বই কোটি সেনাবাহিনী রয়েছে। এ ছাড়া ষোলো হাজার দেবতা আমার সেবায় নিয়োজিত।

এখন কেন আমি ধাতকিখণ্ডের ভারতক্ষেত্রের ছয়টি ব্লক জয় করব না? এবং তিনি বারো যোজন চর্মরত্নের দ্বারা একটি শিবির প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর ছিয়ানব্বই কোটি সৈন্য নিয়ে তিনি শিবিরে আরোহণ করেন। ষোলো হাজার দেবতাকে শিবিরে ওঠার নির্দেশ দিলেন। সাগরের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া দুই লক্ষ যোজনার লবণ ধাতকিখণ্ডে পৌঁছে। সমস্ত দেবতা কাজে লেগে গেলেন, সাগরের ওপর দিয়ে উড়ে এগিয়ে যাচ্ছে সেনাদল। এবং...

এবং কর্মসত্তার দরবার থেকে আদেশ মকুব করা হয়েছিল। একজন দেবতা ভেবেছিলেন - অন্য ১৫,৯৯৯ দেবতা এই শিবিরটি নিয়ে যাচ্ছেন। আমি একা ছেড়ে দিলেই বা কী হবে? সেই দেবতা সরে গেলেন। কিন্তু এইরকম চিন্তা যেন তিনিই একমাত্র করেননি। ষোলো হাজার দেবতা... সবাই একসাথে সরে গেলেন। কারণ একই সময়ে সবার মনে একই ভাবনা চলছিল। আর শুভূমচক্রবর্তীকে পুরো শিবির নিয়ে লবণসমুদ্রে জলসমাধি নিতে হয়।

সাধারণত দেবতারা খুব নিষ্ঠাবান। কেউ কখনও অবিশ্বস্ত হয় না। আমার না থাকায় ছাউনি জলে ডুবে যাবে এমনটা যদি সামান্যতম কল্পনাও থাকত তাহলে একজন দেবতাও নড়তেন না। কারণ একজন দেবতাও চাননি ছাউনি ডুবে যাক। তবুও এমন ইচ্ছা প্রতি দেবতার হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ ছাউনি ডুবে গিয়েছিল। এমন ইচ্ছা কে অনুপ্রাণিত করেছিল? আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, কর্মসত্তা সব দেবতাদের মনে এই ধরনের চিন্তা জাগিয়েছিল। এবং এগুলো শুভূমকে যে শাস্তি দিতে হবে তা কার্যকর করা হয়েছে।

'ভীমসেন-চরিত্র'-এর কিছু বাণীও একই সত্য ব্যবহার করে। তাঁর খুব কঠিন সময়ে, ভীমসেন জানতে পেরেছিলেন যে বারো যোজন দূরত্বে অবস্থিত নাপুরনগরের রাজা অরিঞ্জয় অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং উদার। প্রতি ছয় মাসে একবার, তারা তাদের রাজ্যে যাত্রা করে এবং ভ্রমণে যায় এবং দুঃখী মানুষের দুঃখ দূর করে। তারা ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়, গরিবদের টাকা দেয় এবং অকেজোদের কাজ দেয়। চাকরিতে বেতনও দেয় বিপুল পরিমাণ বত্রিশ টাকা। তাঁর জামাতা জিৎশত্রু বেতন হিসেবে চৌষট্টি টাকা দেন। ভীমসেন অনেক আশা নিয়ে মর্যাদায় পৌঁছেছিলেন। সেখানে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, রাজার জামাতা জিৎশত্রু একদিন আগেই রওনা দিয়েছিলেন। তিনি সব দুঃখীদের দুঃখ দূর করেছেন। এখন ছয় মাস অপেক্ষা করতে হবে। ভীমসেনের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। কিন্তু করুণাময় ও বিনয়ী ধনসার শ্রেষ্ঠ তাঁকে আশ্রয়

দিয়েছিলেন। ছয় মাস কেটে গেছে। তিনি রাজা অরিঞ্জয়ের সাথে দেখা করলেন। রাজার অনুরোধে তিনি তাঁর সব কথা বর্ণনা করলেন। তাঁর কথায় সত্য যে কারও হৃদয় গলিয়ে দিতে সক্ষম ছিল। তাহলে এই রাজাই পরদুঃখভঞ্জন, সহানুভূতিশীলতা ও পরোপকারকে তাঁর জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে মনে করেন। এটা সম্ভব ছিল না যে তারা ভীমসেনের দুঃখ দূর করবে না। কিন্তু কর্মশক্তি...! এরকম একজন গুণী হৃদয়ের রাজাও ধারণা পেয়েছিলেন, এই লোকটিকে ধূর্ত মনে হয়। অন্যথায়, রাজা হরিষেণও পরোপকারী এবং উদার। কেন তোমাকে তোমার শহর ছেড়ে এখানে আসতে হলো? আমি যদি এই কাজ করে আটকে যাই? কিছু ভুল হচ্ছে... এই চিন্তা সেই উদার রাজাকে কৃপণ করে তুলেছিল।

আমার কোনো মানুষের দরকার নেই। এই বলে রাজা ভীমসেনকে উদ্ধার করলেন। আবার বিভ্রান্ত ভীমসেনকে ধনসার শ্রেষ্ঠী দখল করে নেন। বলেছেন - আরো ছয় মাস অপেক্ষা করুন। জিৎশত্রু নিশ্চয়ই তোমার দারিদ্র দূর করবে। আশায় আশায় ভীমসেনের আরও ছয় মাস কেটে গেল। কিন্তু জিৎশত্রুও কর্মসত্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। যখন রাজা নিজেই তাঁর হাত ধরেননি, তখন আমারও সাবধান হওয়া উচিত। মসুর ডালে অবশ্যই কালো কিছু আছে। এবং ভীমসেনের কাছে তিনি কোনো সহানুভূতি দেখাননি। আজ অবধি, ধনসার শ্রেষ্ঠীর মনেও, যিনি ভালবাসা এবং দয়া দেখিয়েছিলেন, কর্মের শক্তি শয়তানকে জাগ্রত করেছিল। সেই ধনী শ্রেষ্ঠী ভীমসেনকে অস্ত্র ফেরত দেননি, বেতনও দেননি। শুধু তাই নয়, তাঁকে ধূর্ত বলে ডেকে তাঁকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। ভীমসেনের আনুগত্য, ভালো আচরণ, সেবা ... সকল ভদ্রলোকের কাছে কর্মসত্তার পরিকল্পনা ধনসার শ্রেষ্ঠীর স্মৃতি থেকে মুছে যায়।

এখন শ্রেষ্ঠী রত্নসার একীভূত হয়েছে... রত্নাসার ছিলেন একজন দয়ালু, উদার ভক্ত। তিনি ভীমসেনের করুণাময় কাহিনি দ্বারা খুব অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং ভীমসেনকে খুব খুশি করেছিলেন যিনি এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও তাঁর সত্যতা ত্যাগ করেননি। কর্মসত্তা তাঁর চিন্তা পরিবর্তন করতে পারেনি, তাই তিনি ভীমসেনকে ভুল করতে পেয়েছিলেন। নয় লক্ষ টাকা মূল্যের রত্নসার শ্রেষ্ঠী প্রদত্ত রত্নসমৃদ্ধ একটি কাঁথা নিয়ে তিনি ক্ষিতিপ্রতিষ্ঠিত নগরের বাইরে পৌঁছে যান। সেখানে বিশুদ্ধ জলে ভরা জলাশয় দেখে কর্মসত্তা তাঁকে স্নান করতে উদ্বুদ্ধ করেন। নির্জন জায়গাটিকে

নিরাপদ মনে করে, জামাকাপড় এবং কাঁথাকে পাড়ে রেখে, তিনি জলাশয়ে স্নানে নামেন এবং কর্মসত্তা - যা ভীমসেনের জন্য সবকিছু ছিল, যা তাঁর জীবনের থেকেও মূল্যবান ছিল, এই ধরনের কাঁথা বানর দ্বারা অপহৃত করান। ভীমসেন আত্মহত্যার কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন, বানরের কোনো ইচ্ছা ছিল না তাঁর উপর এমন প্রচণ্ড আঘাত করার। তিনি কেবল কর্মসত্তার খেলার মাধ্যম হয়ে উঠতেন। রত্নটি কেড়ে নিয়ে তিনি কেবল কয়েক মুহূর্তের জন্য এটির সাথে খেলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এই খেলায় ভীমসেন খুব দুঃখী ও বিচলিত হয়ে পড়লেন, তাই না?

এই সময় একজন জটাধারী সন্ন্যাসী এলেন। তিনি ভীমসেনকে বাঁচিয়েছিলেন, যিনি একটি বটগাছের ডালে গলায় ফাঁস ঝুলিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করছিলেন। তার হৃদয়বিদারক করুণার কথা শুনে তাঁর হৃদয়ও করুণাময় হয়ে ওঠে। ভীমসেনকে উত্তরসাধক বানিয়ে, তিনি চারটি তুম্বা সুবর্ণর প্রমাণ করলেন, যার মধ্যে একটি তুম্বা রস যে সন্ন্যাসী সৎ চিঠির আকারে ভীমসেনকে উদারভাবে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। এখন দুজনেই শহরের সীমানায় ফিরে আসে। সন্ন্যাসী ভীমসেনকে শহরে খাবারের ব্যবস্থা করতে পাঠালেন। তাকে এভাবে পাঠানোর পেছনে সন্ন্যাসীর কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্তে ভীমসেন চলে গেলেন, তৎক্ষণাৎ কর্মসত্তা সন্ন্যাসীর ভালো অনুভূতিকে কলঙ্কিত করে দিল। তার মনে একটা প্রতারণার জন্ম হয়েছিল। ‘‘আমি কেন ভীমসেনকে একগাদা রস দেব?’’ এই চিন্তার উদয় হওয়ার সাথে সাথেই তিনি সন্ন্যাসী ভীমসেনের আগমনের আগে সেখান থেকে উধাও হলেন।

৪. অপরাধকে ভয় পান

সুরসন্দরী ও অমরকুমারের গল্পও মনে পড়ে যাক। সুরসুন্দরী ছিলেন রাজকন্যা এবং অমরকুমার নগরশ্রেষ্ঠীর পুত্র। এটা ছোটবেলার কথা। ঘুমন্ত সুরসুন্দরীর সাতটি কড়ি কুড়িয়ে তা দিয়ে মিষ্টি কিনে অমর সব বাচ্চাদের মধ্যে বিতরণ করলেন। ঘুম থেকে উঠে সুরসুন্দরীকেও তার ভাগের মিষ্টি দেওয়া হয়। কার কাছ থেকে এই মিষ্টি? রাজকুমারী জিজ্ঞেস করলেন।

''তোমার কাছ থেকে'' একথা বলার পর অমর পুরোটা খুলে বলল। অমর ভাবল, সুরসুন্দরীও এই মজা-ঠাট্টায় খুশি হবে। কিন্তু ঘটল একেবারে উল্টোটা। সুরসুন্দরী রেগে গেলেন।

এভাবে চুরি করা কোথায় শিখলে? এমন কথায় তিনি অমরের হৃদয়ে আঘাত করেছিলেন।

অমর বলল - ''তামাশা করে করা কাজকে এত গম্ভীরভাবে নিও না...'' কিন্তু রাজকুমারী একটি গুরুতর কটাক্ষ করলেন ... ''আপনি সাতটি কড়ি ছোট মনে করেন। আমি সাত কড়ির কাছ থেকে রাজ্য পেতে পারি। যদিও পরে রাজকুমারী নিজেই তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি খুব দুঃখ পেলেন। পরের দিন অমর তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁর হৃদয় জয় করেন। এই ঘটনার প্রভাব তাঁদের উভয়ের হৃদয়েই ছিল না এবং তাদের পারস্পরিক স্নেহপূর্ণ আচরণেও ছিল না।

সময় কেটে গেল। দুজনেই বয়ঃসন্ধির দোরগোড়ায় পা রাখল। সময়মতো দুজনেই বিয়ে করলেন। দুজনেই মেধাবী। দুজনেই দার্শনিক, তাঁরা একে অপরকে খুব ভালোবাসেন। দুজনের কারোরই সাতটি কড়ির কথা মনে নেই এবং এই কারণে দুজনেই একে অপরকে জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।

একদিন সমুদ্র ভ্রমণ করতে করতে তিনি নরখাদক যক্ষের দ্বীপে পৌঁছে যান। সেখানে মনোরম পার্কে, তাঁরা দুজনে ঘুম পেতে লাগল। অমরের কোলে মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়ল। সুরসুন্দরীর রূপে ভালবাসায় পরিপূর্ণ সুন্দর,

নিষ্পাপ মুখের সৌন্দর্য পান করতে করতে সাতটি কড়ির প্রসঙ্গ হঠাৎ মনে পড়ল অমরের। তার অপমানের স্মৃতি, সুরসুন্দরীর অহংকার এবং রাগ—এই সবই আমার মনকে তিক্ত করে তুলেছিল। এক মুহূর্তে - দুই মুহূর্তে, মন এতটাই বিষিয়ে উঠল যে তিনি ঘুমন্ত সুরসুন্দরীর শাড়ির আঁচলে সাতটি কড়ি বেঁধে দিলেন। রাজ্য পাওয়ার নোটিশ লিখে ভিত্তিহীন রেখে সৈকতের দিকে ছুটলেন। ''নরখাদক যক্ষ এসেছিল, সুরসুন্দরীকে ধরেছিল এবং আমি বহুকষ্টে নিজেকে বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছি। আমাদের পালাতে হবে।" অমরের এই কথাগুলো শুনে সবাই তাড়াহুড়ো করে বসল। নোঙরগুলি তুলে নেওয়া হল এবং জাহাজ ছেড়ে দিল। এই ঘটনা ঝড়ের মতো হয়ে গেল। কিন্তু ফলাফল? সুরসুন্দরী বারবার বিভিন্ন ভয়াবহ অসুবিধার মধ্যে পড়ে, যা দেখার পর যে কোনো ব্যক্তির চোখ আর্দ্র না হয়ে থাকতে পারে না। যদিও অমর তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হন। তিনি প্রতিদিন চোখের জল ফেলেন। সুরসুন্দরীর প্রতি তাঁর ভালবাসা আগের মতোই অটুট আছে এবং এই কারণে এক উদাসীনতা তাকে ঘিরে রেখেছে। এখানে সুরসুন্দরী তার জীবনের চেয়ে তার বিনয়কে বেশি বাঁচিয়েছেন এবং এর প্রভাবের কারণে, তিনি এত বড় বিপদেও রক্ষা পেয়েছেন। সে সারাংশ বোঝে। কর্ম বিজ্ঞান ব্যবহার করে তিনি প্রতিটি আপত্তিতে আত্মদোষের চিন্তা করেছেন। এই কারণেই অমরের প্রতি তার অন্তরে কোনো ক্ষোভ বা অমঙ্গল নেই। তার হৃদয়ে অমরের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা রয়েছে। দীর্ঘ বারো বছরের ব্যবধানে দুজনের দেখা হয়। কিন্তু অমরের ত্যাগের কারণে সুরসুন্দরীকে বারবার কষ্ট সহ্য করতে হয়।

এই সমস্ত দৃষ্টান্তে এটা স্পষ্ট যে নিপীড়িত প্রাণীটি শিকারের শত্রু নয়। শত্রুতার কারণে এমন প্রবণতা নেই। শুধু সেই মুহূর্তে ইচ্ছা ছিল এবং এই ধরনের একটি প্রবণতা তৈরি হয়েছিল কিন্তু সেই প্রবণতার ফলস্বরূপ, ভোগান্তির সীমা ছিল না। অতএব, বিশ্বাস করা উচিত যে, নির্যাতিতকে এমন শাস্তি দেওয়ার জন্যই কর্মসত্তা নিপীড়িত জীবের মনে এমন ইচ্ছা জাগিয়েছিলেন। এবং যেভাবে কর্মের শক্তি একজনের মনে ক্ষতবিক্ষত জীবকে যন্ত্রণা স্বল্পমেয়াদি ইচ্ছা জাগিয়ে তোলে, একইভাবে অন্য দুঃখজনক অবস্থার সাথে নিপীড়িত ব্যক্তিও ভুক্তভোগীর মনে দীর্ঘদিন ধরে তাকে যন্ত্রণা দেওয়ার ইচ্ছা জাগিয়ে তুলতে পারে। যাতে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে যন্ত্রণা সহ্য

করতে পারেন। দশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দিকে কারাগারে পাঠানো আকাঙ্ক্ষা আমরা দেখতে পাই, কিন্তু এমন আকাঙ্ক্ষা যদি এতদিন স্থায়ী হয়, তার পেছনে শুধু বিচারকের নির্দেশ থাকে, তাই না? অর্থাৎ, এটা নিশ্চিতভাবে নিশ্চিত যে কোনো জীব স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কর্মসত্তার অনুপ্রেরণায় বা আদেশের কারণে কর্মসত্তার দ্বারা প্রদত্ত শাস্তি কার্যকর করে, এবং তাই এটাই নিশ্চিত যে যন্ত্রণা প্রদানকারী ব্যক্তি শুধুমাত্র কারারক্ষী। তিনি এর চেয়ে বেশি কিছু নন, অর্থাৎ আত্মা সর্বাধিক কারাগারে পরিণত হতে পারেন, স্বাধীনভাবে, অর্থাৎ, কর্মসত্তার আদেশ ব্যতীত, শাস্তি দেওয়ার জন্য বিচারক হতে পারেন না এবং সেজন্য তিনি শাস্তিকে সামান্যও বাড়িয়ে দিতে পারেন না তার ইচ্ছার অংশ বা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না।

প্রশ্ন। আপনি ঠিক আছেন, কিন্তু সহ্যের একটা সীমা থাকা উচিত, তাই না? দুঃখের সময় যতই বাড়বে, তার শেষ দেখা না গেলে, স্ট্যামিনাও শেষ হয়ে যাবে, তাই না?

পাল্টা প্রশ্ন। আমাকে বলুন, দুঃখ কত প্রয়োজন?

উত্তর। দুঃখের প্রয়োজন নেই। সবাই শুধু সুখ আশা করে।

"এটি একটি ভালো জিনিস।" নোংরা, কালো, দুর্গন্ধযুক্ত গুটানো জল একটি কলসিতে ভরাট করার জন্য একটি কলসিতে ভরা হয়েছিল। তারপর কলসির জলেতে আকাশের দিকে ছুড়ে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, হে প্রভু! আমার মাথায় গোলাপ জলের বৃষ্টি হোক! কিন্তু সেই একই দুর্গন্ধযুক্ত জল তার মাথায় পড়ল। তাই সে এখন প্রভুর কাছে নালিশ করতে লাগল "প্রভু! তোমার কোনো প্রভাব নেই। এত প্রার্থনা করলাম, তবুও জল নোংরা জলই পড়ল!"

এবার বলো! এই লড়াইকে কী বলব? "ভাই! যদি গোলাপ জল প্রত্যাশিত হত, তাহলে কলসিতে শুধু গোলাপ জল ভরতে হত, নর্দমা নোংরা জলে ভরতে গেলে কেন?"

সবার ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটে। সময় পেয়েছি, টিভির সামনে বসলাম, সম্পত্তি বাড়ল ... জলের রাজত্ব ... চোখের সামনে সুন্দর মুখ এল, চোখ আটকে গেল ... কেউ কেউ কিছু শব্দ বলেছিল বিরক্তিকর ... বিভ্রান্তি শুরু হয়েছিল, এখানে থেকে সেখানে কিছু সেই রাগের উদয় হোক...! যেতে দাও

... যেতে দাও ... এমন কিছু নেই। একজনকে জীবনের কলসিতে সঞ্চিত জল ভরাট করতে হবে এবং ল্যাকসেটিভের আশা রাখতে হবে - এর বিচার কী? এবং, তারপর আমি দোষ দেই... আমি সেটাই করি... কিন্তু দুঃখগুলো কমে না...”

একজনকে ক্রমাগত অপরাধ করতে হবে কিন্তু শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। এটি ‘‘অতীত বা ভবিষ্যৎ নয়”—এর মতো। তবু, ধরুন প্রকৃতি এটা মেনে নিতে রাজি হয়েছে, তাহলে আপনার মানা করবেন।

না না ... আমি মানা করব না।

দাঁড়ান ... প্রথমেই বলুন তো অপরাধ সম্বন্ধে আপনি কি কিছু জানেন?

‘আজ্ঞে, না।’

না, না বলবেন না...। আপনাদের মধ্যে অনেকে জানেন ... আপনি যদি বলি আপনারাও বলতে লাগবেন। প্রথমেই হিংসা, দ্বিতীয়ত অসত্য, তৃতীয়ত চুরি ... আঠারোটি পাপাস্থানকের তালিকা ... সংক্ষেপে, যে সকল ধর্মের জন্য প্রভু নিষেধ করেছেন যে সমস্ত কাজ অপরাধের প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে, প্রকৃতি সেসব কাজের শাস্তি দেয়। অন্য কথায়, প্রকৃতির নিয়মে যা আছে, সেসবকে প্রভু পাপ বলেছেন। যে শাস্তি পেতে চায় না তার উচিত এসব পাপ থেকে দূরে থাকা।

এ নিয়ে অনেকেই যুক্তি দেন—‘‘আমি রাতের খাবারকে পাপ মনে করি না।” ‘‘আমি কন্দের শিকড় খাওয়াকে পাপ মনে করি না” ‘‘আমি অনৈতিকতাকে পাপ মনে করি না” ইত্যাদি।

‘‘তুমি চুরি করেছ তাই তোমাকে এত শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।” বিচারক এমন ঘোষণা দেন, তাহলে বন্দি যদি বলে যে আমি চুরিকে অপরাধ মনে করি না, তাহলে কি তার সাজা মকুব হয়? বিচারক বলবেন, হে মূর্খ! আপনি কী বিশ্বাস করেন এবং আপনি কী বিশ্বাস করেন না তার কোনো মূল্য এখানে নেই। আমাদের আইনে যা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হোক না কেন, শাস্তি তো থাকবেই... নিশ্চয়ই থাকবে...

ঠিক এভাবেই প্রকৃতির দরবার-কর্মসত্তা আত্মাকে বলে, ‘‘আরে... তুমি কোন খেতের মূলা? আপনার সংবিধান অনুযায়ী যে পাপ করা হয়েছে তার শাস্তি পেতেই হবে।”

সরকার যদি এমন একটি বিল আনতে চায় যাতে আমাদের দেশে এখন কোনো আদালত থাকবে না, কোনো বিচারক থাকবে না, কোনো অপরাধী হবে না, কোনো ধরনের শাস্তি হবে না এবং এ বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চান, তাহলে আপনি বলবেন ''হ্যাঁ'' বা অথবা ''না''?

''না? একই কথা বলবে অন্যথায় আমাদের জীবন কঠিন হয়ে পড়বে।''

একইভাবে মাঝে মাঝে প্রকৃতি আপনাকে জিজ্ঞেস করে, ''বলুন, কর্মসত্তার আদালত ভেঙে দিতে হবে?'' তাই আপনি বলছি হ্যাঁ বা না বলবেন?

''না বলব।''

তাই না? আপনি যুক্তি দিয়ে বলছেন না কি শুধু কথার কথা বলছেন? সাধারণত মনের মধ্যে একটা ভাবনা থাকে যে, অন্যদের জন্য এই আদালত থাকতে হবে, শুধু আমিই এর থেকে মুক্তি পাব। অর্থাৎ কেউ যদি আমাকে হয়রানি করে, মিথ্যা কথা বলে, আমার সঙ্গে অনৈতিক আচরণ করে, আমার ওপর রাগ করে, তাহলে তার শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু আমি যদি কাউকে হয়রানি করি, অসত্য কথা বলি, চুরি করি বা রেগে যাই, তাহলে আমার শাস্তি হওয়া উচিত নয়।

কিন্তু প্রকৃতি বড়ই উদার। অন্যদের শাস্তি দাও, আমাকে না? এই চাহিদাকে স্বীকার করতেও প্রস্তুত। কিন্তু প্রকৃতি বলে—তুমি যেমন বলো, তেমনি তোমার প্রতিবেশীও বলে। তাই হয় কারও শাস্তি হয় না, নয়তো সবাই শাস্তি পায়। এই দুটি বিকল্পের কোনটি গ্রহণ করা উচিত? প্রকৃতি যদি আপনার উপর সিদ্ধান্ত নেয় তবে আপনি কোন বিকল্পটি বেছে নেবেন?

সবাইকে শাস্তি দিন।

আপনি এই বিকল্প মানে কী জানেন? এর মানে হচ্ছে, প্রতিদিন প্রশ্ন করার সামনে কথা বলতে হবে। এর অর্থ—প্রভু! আমি যদি আমার মন, কথা ও শরীর দিয়ে কাউকে আঘাত করি বা কাউকে দুঃখ দিই তাহলে আমাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। কাটা কাটা কথা বলে কারও হৃদয়ে আঘাত করলে আমার শাস্তি হওয়া উচিত, নইলে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে। প্রভু... আমি যদি অসত্য বলি... আমাকে শাস্তি পেতেই হবে... প্রভু! আমি চুরি করব... মন্দ করব... বিশ্বাসঘাতকতা করব... আমাকে শাস্তি পেতেই হবে। অর্থাৎ এক টাকার নীতির ফলে আমার অন্তত দশ টাকা হারাতে হবে, নইলে দুনিয়ার

ব্যবস্থা বেঙে পড়বে। প্রভু! আমি যদি কারও মা-মেয়ে-বোনকে কুদৃষ্টিতে দেখি, তাহলে আমাকে শাস্তি পেতে হবে, না হলে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যাবে। রাগ করলে শাস্তি পেতেই হবে। এই প্রার্থনা—এই শব্দগুলি আমাদের প্রতিদিন ঈশ্বরের সাথে কথা বলা উচিত।

অর্থাৎ পৃথিবীতে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অপরাধের শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমি অপরাধ করলে আমাকেও শাস্তি পেতে হবে। আমি যদি শাস্তি ভোগ করতে না চাই, অর্থাৎ দুঃখের যন্ত্রণা, তাহলে আমাকেই অপরাধবোধ ও পাপের চর্চা বন্ধ করতে হবে।

অনেকে এটাও বলে যে পাপের সংস্কৃতি এতই প্রবল হয়েছে যে পাপ হতেই থাকবে। কিন্তু প্রকৃতি নিজেই যদি তার নিয়ম, তার নিয়ম পরিবর্তন করে? অর্থাৎ গুনাহকে অপরাধ না ভেবে ভালো কাজ মনে করে সওয়াব দেওয়া শুরু করি, তাহলে আমাদের কোনো প্রকার কষ্ট হবে না।

পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর লিখে আসা ছেলেটি তার মাকে বলতে লাগল ''মা! কলম্বো যদি ভারতের রাজধানী হয়...?''

মা জিজ্ঞেস করলেন, ''বাছা, তুমি এসব বলছ কেন? কলম্বো শ্রীলঙ্কার রাজধানী।

ছেলে উত্তর দিল—''মা! আমি এই কাগজে এটাই লিখেছি...''

গ্রহণ করা... তিনি নিজে এই লিখে পরীক্ষায় এসেছেন, তাই তিনি চান কলম্বো ভারতের রাজধানী হোক। একইভাবে, সে নিজেকে খারাপ কাজ থেকে আড়াল করে না, তাই সে চায় প্রকৃতি তার বিশ্বাস পরিবর্তন করুক এবং অপরাধকে একটি ভালো কাজ হিসাবে দেখুক। আচ্ছা... আমি বললাম না, প্রকৃতি খুব উদার। ধরা যাক এটি এমন পরিবর্তন করতে প্রস্তুত। কিন্তু তখন প্রকৃতিও আমাদের প্রশ্ন করে—কেউ যদি তোমাকে চড় মারে, আমি কি তাকে ভালো কাজ বলে পুরস্কৃত করব নাকি? বিশ্বাসঘাতকতা করে যদি ব্যবসায় লাখ লাখ টাকার ক্ষতি করে থাকেন, তাহলে আমার তাকে পুরস্কার হিসেবে দশ লাখ টাকা দেওয়া উচিত ছিল না?

''না... না... তাকে কি একটু পুরস্কৃত করা যায়? তাকে শাস্তি পেতেই হবে।'' অর্থাৎ সহিংসতা, অসত্য, চুরি ইত্যাদিকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, তাই না? এমন অপকর্মের শাস্তি তো হবেই, তাই না? তারও একটা

শাস্তিমূলক কর্ম থাকা উচিত, তাই না? প্রকৃতির সব নিয়মই বৈধ, তাই না? অর্থাৎ, আমরা যদি শাস্তি না চাই, তাহলে আমাদের পাপ কাজ ত্যাগ করা উচিত, এটাই একমাত্র পাহারাদার... এটা কি ঠিক...?

এখন আমাদের মৌলিক বিষয় বিবেচনা করা যাক। আমাদের কথা ছিল সহ্যের একটা সীমা থাকা উচিত... কষ্ট যদি চলতেই থাকে, চলতেই থাকে, তাহলে কবে কষ্ট পেতে থাকবে? কন্যা আরও বলেন, 'শাশুড়ির যন্ত্রণা সহ্য করতে থাকো। কিন্তু দুই বছর কেটে গেল। এখন কতদিন সহ্য করতে পারব? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে বন্দির কথাই মনে পড়ে যাক।

বন্দিকে কতদিন সাজা ভোগ করতে হবে?

সাজার মেয়াদ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত...

বিচারক ওই অপরাধীকে দশ বছরের কারাদণ্ড দেন। বন্দি বলল, নামদার! দশ বছর না। এত লম্বা সময়... না না নামদার... এত লম্বা সময় আমি সহ্য করব না। দয়া করে দুই বছরের সাজা দিন... তার কথা কি মেনে নেওয়া যায়।

শাস্তি কি অপরাধীর ইচ্ছা অনুযায়ী নাকি তার অপরাধ অনুযায়ী? একইভাবে, জীবনে দুঃখ-কষ্ট কি আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী না আমাদের কর্ম অনুসারে বাসা উচিত? যে দুঃখ চায় না সে যেন পাপ না করে। আর যদি গুনাহ হয় বা কেউ এ ধরনের কাজ করতে বাধ্য হয়, তাহলে শাস্তি হতে বাধ্য, আর যদি শাস্তি সীমিত করতে চান, তাহলে পাপ কাজেরও একটা সীমা থাকা উচিত। অপরাধের কোনো সীমা বেঁধে দেওয়া নেই, সীমাহীন পাপ করতে হবে আর শাস্তি সীমিত হতে হবে... এই কন্যা কোথায়?

আপনি কি বহু বছর ধরে টিভি দেখছেন? ঠিক আছে এখন দেখা বন্ধ করতে হবে। অনেক সিরিয়াল দেখেছি, অনেক ক্রিকেট ম্যাচ দেখেছি, দেশ-বিদেশের অনেক খবর শুনেছি...

এখন এইসব ছেড়ে দিতে হবে...?

না... না... জীবনের শেষ দিনে এসব দেখতে হবে না, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। একটি ভক্তিমূলক গান আছে...

ভক্তি কর্তা ছু তেমারা প্রাণ... আমি প্রভু এবুং আমি মাঙ্গু ছুং...।

(হে ভগবান, তোমার ভক্তি করতে গিয়ে আমার মৃত্যু হোক এটাই চাই...)

ধরা যাক, অনেকে সামান্য পরিবর্তন করে এই গানটি গাইতে চান।

টিবীজোতা ছু তেমারা প্রাণ... প্রভু হুঁ এবুং মাঙ্গু ছুং...।

(প্রভু! আমি শুধু চাই টিভি দেখতে দেখতে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাক যাক...)

টিভি দেখতে দেখতে নির্লজ্জতা এসেছে জীবনে। এমন অশ্লীল দৃশ্য দেখার সময় আপনার বিনয় লজ্জার চিহ্ন পর্যন্ত স্পর্শ করে না। আপনি কি আপনার স্ত্রী, কন্যা বা বোনের দৃশ্য দেখতে চান যেভাবে অন্য লোকেরা আপনার স্ত্রী, কন্যা বা বোনের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে? না না? তাহলে বুঝুন টিভি অনেক দুর্ভাগ্যের মূল। টিভি দেখা পাপ।

প্রথমত, সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হিসাবে যেমন একটি জিনিস আছে। অনেক কিছু দেখেছি... এখনই না... এখনও অতটা শক্ত নয়, পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া কঠিন মনে হচ্ছে, তাই নিজের ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে কি না? আমার দুটি সমাধান আছে। আমাকে বলুন।

শেষ দশ মিনিট দেখবেন না - ৩০-৩৫-৪০ মিনিটের সিরিয়ালের শেষ অংশ আপনি দেখছেন। একদিনের ম্যাচের শেষ পাঁচ ওভার দেখা এড়িয়ে যান।

তার মধ্যে একটা টানাপোড়েন আছে, সত্যিকারের সুখের ব্যাপার। তার একটা আকর্ষণ আছে, সে কীভাবে ছোঁবে?

তাই প্রথম ৪৫ ওভার দেখবেন না।

সমাবেশ - এই না দেখলে মজা পাবে কোথায়?

এটা ভালো তাই না? দেখার কোনো আকর্ষণ নেই, এটাই তো কাম্য, তাই না? ঠিক আছে, আসুন অন্য সমাধান দিয়ে যাই। প্রতিবার কয়েকটা পর্ব দেখার পর একবার ঘুরে আসুন... সমস্ত সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও, আপনি যদি দেখতে না চান তবে দেখতে হবে না...

সভা : তাহলে তার সাথে তার লিঙ্ক বাতিল করা হবে।

তাহলে তাতে সমস্যা কী? যাইহোক, আপনি 6 পর্বে থাকেন। এই তোমার অভ্যাস! চাতুর্মাসের দিনে পাঠ্য বক্তৃতা হয়, তারপর প্রতিদিন দেওয়া জয়া বক্তৃতাগুলি এক পর্বের সমান। তবুও, আপনি খুব সাধারণ ভান করে মাঝে মাঝে লেকচার দিতে থাকেন, তাই না? দেরি করে এসো, তাড়াতাড়ি চলে যাও... এটুকুই মেনে নিও...!

এটা হাসির বিষয় নয়। টিভি একটা অপরাধ। আপনি যদি এর ব্যবহারে একটি সীমা নির্ধারণ করতে না চান, তাহলে ভবিষ্যতে অসহনীয় শাস্তি সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকুন। তাহলে চোখের জল ফেলে লাভ হবে না। একইভাবে, আপনি ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে আপনার ব্যবসা করছেন। ব্যবসা শুরুর পর থেকেই চলছে অনৈতিকতা-ভেজাল-বিশ্বাসঘাতকতা। জমা করেছেন প্রচুর সম্পদ। এখন দুর্নীতি ছাড়তে হবে।

না, আমরা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্যবসা চালিয়ে যাব... এবং কতক্ষণ পর্যন্ত খারাপ কাজ করতে থাকব... যদি এই অভিপ্রায় হয়, তাহলে কর্মসত্তারও একই অভিপ্রায় থাকবে। পরকালে প্রবল দারিদ্র, সতী রমণীর মতো তোমার ছায়া হয়ে ফিরেছে। আজও এমন অনেক গরিব মানুষ আছে। তারা বুদ্ধিমান, তারা খুব পরিশ্রম করে কিন্তু তারা কোনো টাকা পায় না। প্রতিবারই কিছু অশুভ কর্ম এইরকম ধাক্কা ও পতনের পূর্বাভাস দেয়। যে মুখগহ্বর হাতে আসে তা অন্য কেউ কেড়ে নেয়, ঠোঁটে যে পেয়ালা আসে তা নেওয়া হয় না... এবং এটাও চিরকাল হয়।

বড় হতাশা, বড় হতাশা, ভয়াবহ পরাজয়। কয়েক টাকার জন্য অনেকের পায়ে পড়া, অনেককে তোষামোদ করা, অপমানের তেতো বিষ খেতে থাকা। এসব করেও সামান্য টাকাও পায় না। রুটির টুকরোর জন্য প্রতিদিন শুধু কষ্ট...। এ সব কতদিন? জীবন শেষ হতে যায় কিন্তু কঠিন শেষ কোথাও দেখা যায় না। যারা মন্দকে ত্যাগ করতে চায় না, তাদের চিরকাল স্মৃতিতে রাখা উচিত একজন হতভাগ্য পুরুষকে যে এতদিনের নীচ, নিকটাত্মীয়ের মতো স্ত্রীর কাছে অপমানিত। আপনি যদি বিশ কোটি থেকে পঁচিশ কোটি বা ৫০ কোটিতে পৌঁছেও থাকেন... তবে আপনার টাকা বৃদ্ধি ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হবে না। কিন্তু এই বৃদ্ধির জন্য করা ছলনা, প্রতারণা ও অনৈতিক কাজগুলো মৃত্যু পর্যন্ত তাড়না করতে থাকবে পরকালের ভোগ-বিলাস বা সুবিধাজনক জিনিসকেই নয়, জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকেও অত্যন্ত দুর্লভ করে দিয়ে। প্রতিটি মানুষকে সারাজীবন এটি মনে রাখতে হবে। প্রকৃতি যদি সমস্ত কালো কাজ, অপ্রমাণ ইত্যাদির হিসাব না রাখত এবং সম্পদ অর্জনের জন্য করা সমস্ত কাজের শাস্তি না দিত, তাহলে পৃথিবীতে ন্যায়বিচার বলে কিছু থাকত না।

তেমনি রাগান্বিত স্বভাব, - কথায় রাগ হইল, বারবার রাগ হইল, খুব রাগ হইল। এখন এই প্রকৃতির পরিবর্তন হবে কি না? এখানে না বদলালে কোথায় বদলাবে? ''প্রকৃতি এবং জীবন একসাথে যায়'' মানে প্রকৃতি চলে যায় না, জীবন যেখানেই যায়, তাকে অনুসরণ করে। যদি ছেড়ে না দেন তাহলে লাঠি দিয়ে মাপতে চেষ্টা করব। এখানে রেখে যাবেন না। ছুঁতে পারছে না, কী করব? এমন বিষণ্ণ কণ্ঠে কিছু বলতে হবে না, চেষ্টার লাঠি নিয়ে বসতে হবে না। রাগ করার বদ অভ্যাস মুক্ত হলে নিজেকে শাস্তি দেওয়ার নিয়ম তৈরি করুন। আজ রাগ করলে কাল চার বেলা উপবাস করব। ''যার রাগ হয়েছে তার পায়ে পড়ে ক্ষমা চাও।'' একবার রাগ করলে দশ হাজার টাকা শাস্তি দেব। যা করতে হবে তাই করুন। কিন্তু এখন কোনোরকমে রাগ থেকে মুক্তি পাচ্ছে জল। যারা রাগ করার অভ্যাস ধরে রাখে না, প্রকৃতি তাদের ভবিষ্যতেও বলে দেবে যে আমি আমার আপনার খারাপ অবস্থা করার অভ্যাস বন্ধ করতে পারি না।

এইভাবে প্রতিটি ব্যক্তির সাথে প্রতিটি বিষয়ে মায়া ও অহংকার। কোথাও সরলতা নেই। এটি অপরিচিত, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী বা পিতামাতা বা এমনকী, ঈশ্বরের জন্যও ভাল নয়। জীবনের ষাট, সত্তর, পঁচাত্তর বছর এমন হাস্যকরতা আর অহংকার করে কাটিয়েছেন। এখন কি এই অপরাধ থেকে মুক্ত হতে হবে? ভাই, সহকর্মী, শাশুড়ি, পুত্রবধূ, শ্যালক বা পুত্রবধূকে ধাপে ধাপে যে কোনো ব্যক্তিকে কড়া কথা বলা, কটূক্তি করা, কিছু ঝামেলা সৃষ্টি করা...। দরিদ্র লোকটি দুর্বল, সে সাহসী, সে কোনো প্রকার প্রতিশোধ নিতে সক্ষম নয়, তাই তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে বার বার কঠোর ভাষায় আঘাত করতে থাকে, তার মানসিক কষ্ট দেখে খুশি হওয়া, অন্তরের তৃপ্তি অনুভব করা, তার নিজের ক্ষমতা চালানোর আনন্দ অনুভব করা, তিরস্কার করা এসবই অপরাধ। এই সমস্ত অপরাধ বহু বছর ধরে চলতে থাকে...। এখন এগুলো পরিত্যাগ করব কি না...?

লাগামহীন অপরাধ করা। স্থির করার কোনো সীমা নেই। অপরাধ করে ক্লান্ত হবেন না... তবু শাস্তি সীমিত হওয়া উচিত... শাস্তিতে ক্লান্ত... কীভাবে সম্ভব? শাস্তি এড়ানো, শাস্তি থেকে পরিত্রাণের এটি একটি ভাল উপায় নয়। অপরাধ থেকে পালানো শাস্তির চেয়ে উত্তম প্রতিকার।

গুণসেন - সংক্ষেপে অগ্নিশর্মার চরিত্রটি এরকম - অগ্নিশর্মা। দ্বিজপুত্র হল... পুরো শরীরটা খুব কুৎসিত... ত্রিভুজ মাথা, ছোট বুক... বড় পেট - পাতলা পা... চোখ যা ভিতরে যায়... দাঁত বাইরে বেরোচ্ছে... ইত্যাদি... রাজকুমার গুণসেনের জন্য সে একটা খেলনার মতো হয়ে গেল... বন্ধুদের নিয়ে খুব নিষ্ঠুর উপহাসের কাছে পৌঁছে গেল... গুণসেনের এই ট্র্যাজেডিতে আক্রান্ত অগ্নিশর্মা, কাউকে কিছু না বলে বাড়ি ও শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল... শত মাইল দূরে বনের আশ্রমে পৌঁছে গেল। দূরে... সেখানে অনেক তাপস নানা তপস্যা করছিল... উপাচার্যের কাছে আশ্বস্ত হওয়া অগ্নিশর্মাও তাপসের দীক্ষা নেন। যতটুকু পান তাই করুন... কিছু না পেলেও, অন্য বাড়িতে যেও না... আর নতুন বানাতে শুরু কর... দীর্ঘায়ুর সেই সময়ে লাখ লাখ মানুষ সক্ষম হয়েছেন। কর্ম বিজ্ঞান ক্যাবলে গুণসেনের বিরুদ্ধে আর কোনো ক্ষোভ বা অভিযোগ নেই। রাজা হইয়া গুণসেন আশ্রমে আসিয়াছেন। একে অপরকে শনাক্ত করতে পারেনি।

(অনুসন্ধান - পৃষ্ঠা ৮৮)

৫. সমতা : স্বার্থের ছোট আকার

প্রশ্ন। বিশ্ব আদালত সব কিছু ঘোষণা করে যে অপরাধ কী, কোন ধারা অনুযায়ী শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে, শাস্তির মেয়াদ কী। আর এ কারণে অপরাধী মানসিকভাবে নিজেকে শাস্তির জন্য প্রস্তুত করতে পারে। সেই সঙ্গে এতদিন পর পরিত্রাণ ঘটতে চলেছে এই আশাও সাহস রাখে। কর্মসত্তা আদালত এমন কিছু বলে না।

উত্তর। হ্যাঁ, এটা সত্য। কিন্তু আগে যেমন বলা হয়েছে, ছেলের দোষ কী সে সম্পর্কে কিছু না জানার পরও বাবা তাকে মেরে ফেলছে, এটা দেখে ধারণা করা হচ্ছে, মারামারির কোনো অপরাধ আছে। একইভাবে, যখন শাস্তি দেওয়া হয়, তখন সাধারণত অপরাধটি কল্পনা করা উচিত। আর এমন কল্পনা করেই শাস্তির জন্য মন তৈরি করা যায়। দ্বিতীয় কথা হলো শাস্তির সময়কাল আমাদের বলা হয় না, কিন্তু মেয়াদ পূর্ণ হলে আমরা দুঃখ থেকে মুক্তি পাই। যে জেলর বন্দিকে প্রতিদিন সকাল হতে না হতেই কঠোরভাবে কাজ করতে দেয়, সাজা পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে একই জেলারের আচরণ বদলে যায়। তিনি সসম্মানে বন্দিকে মুক্ত করেন। কর্মসত্তা আদালতের জেলরও তাই করেন।

পবনঞ্জয় বরযাত্রীদের নিয়ে অঞ্জনাসুন্দরীকে বিয়ে করতে আসেন। বিয়ের আগের রাতে ভাবী স্ত্রী কেমন দেখতে তা দেখার কৌতূহল মনের মধ্যে জন্ম নেয়। বন্ধু প্রহসিতের সঙ্গে ছদ্মবেশে রাতে অঞ্জনার প্রাসাদে পৌঁছে গেল। অঞ্জনা তার অপরূপ সৌন্দর্য দেখে বিমোহিত হলেন। অঞ্জনার সখীরা হাসাহাসি করছিল। ব্যাপারটা এমন ছিল যে অঞ্জনার বাবা-মায়ের সামনে দুই রাজকুমারের প্রস্তাব এসেছিল। একটি পবনঞ্জয়ের এবং অন্যটি বিদ্যুৎপ্রভবর। বিদ্যুৎপ্রভ চরমদেহী এবং চরমদেহী হওয়ার কারণে একজনের পক্ষে মহান গুণের অধিকারী হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু স্বল্প জীবনের কারণে পবনঞ্জয়ের সঙ্গে অঞ্জনার বিয়ে ঠিক হয়। পবনঞ্জয়ও গুণী ও পরাক্রমশালী। সখীরা একে অপরের সাথে এমনভাবে কথা বলছে যাতে অঞ্জনা তাদের কথা শুনতে পায়

এবং জ্বলে যায়; সে দীর্ঘজীবী না হলে কী হবে? চরম দৈহিক হল চরম দেহ... জীবন এর সাথে যুক্ত হওয়া উচিত নয়... ইত্যাদি। পবনঞ্জয়, যে ছয় ইন্দ্রিয়ে এসেছিল, সে সব শুনেছিল। আর্য সন্ন্যাসীর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ নন। অঞ্জনার নীরবতা দেখে পবনঞ্জয়ের খারাপ লাগার বা তার সম্পর্কে ভুল ভাবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, জেনে রাখা যে নীরবতাই এমন একটি বিষয়ে আর্যনারীর যথাযথ প্রকাশ। কিন্তু কর্মসত্তা অঞ্জনাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। আর এই কারণেই বিচক্ষণের মনে ভুল চিন্তা জাগল—স্নেহময়ী পবনঞ্জয় "অঞ্জনা আমার পক্ষে কিছু বলে না, বন্ধুদেরও বাধা দেয় না, বিদ্যুৎপ্রভকে নিশ্চয়ই ভালোবেসেছিল।" ফলাফল? প্রথম রাত থেকেই শাস্তি শুরু হয়। পবনঞ্জয় অঞ্জনাকে পরিত্যাগ করেন। অঞ্জনা তো মহাসতী ছিলেন। স্বামীর বিচ্ছেদে তিনি অলংকার পরিত্যাগ করেন। যন্ত্রণা নিয়ে কাজ করে দিন দিন কৃশ হয়ে গেলেন। কিন্তু স্ব-কর্মের দোষ দেখে, পবনঞ্জয়ের প্রতি হৃদয়ে যে স্নেহ ছিল তা তাঁকে অচল রাখল, পবনঞ্জয়ের প্রতি কখনওই বিদ্বেষ বা অসৎ ইচ্ছা হতে দেননি। কেটে গেছে বাইশ বছর। কিন্তু পবনঞ্জয় ব্যতীত আর কোনো পুরুষের কথাও মনে মনে আসেনি। একদিন পবনঞ্জয় যখন যুদ্ধে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি প্রেমের সাথে তাঁর পায়ে প্রণাম করলেন তাঁর শুভেচ্ছা জানাতে। এবারও তার দিকে স্নেহময় দৃষ্টিতে না তাকিয়ে তাকে চরম অবজ্ঞার সাথে অপমান করলেন। স্বামীর অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি যন্ত্রণায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সখী বসন্তিলকা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রাসাদে নিয়ে আসেন।

পবনঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হলেন। সন্ধ্যায়, তিনি তার সেনাবাহিনীকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য হ্রদের উপর শিবির স্থাপন করেছিলেন। নিজের জ্ঞানের শক্তিতে প্রসাদ দাঁড়িয়ে রইল।

রাজপ্রাসাদের গেটে দাঁড়িয়ে লেকের সৌন্দর্য দেখলেন পবনঞ্জয়, দেখলেন চক্রবাকের মুখে চক্রবাকি হাহাকার... দিনের বারোটা ঘণ্টা ওদের সঙ্গে। রাতের মাত্র বারো ঘণ্টা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্যও এমন যন্ত্রণা! এবং... হঠাৎ পবনঞ্জয়ের মনে পড়ল অঞ্জনার কথা। আজ অবধি অঞ্জনার প্রতি তাঁর মনের মধ্যে যে কুসংস্কার ছিল, তা আপনা-আপনি মিলিয়ে গেল। ২২-২২ বছরের বিরহে অঞ্জনার কী অবস্থা হত! প্রেমের এমন স্রোত বয়ে গেল যে এক মুহূর্ত বিলম্বও অসহ্য লাগছিল। তৎক্ষণাৎ বন্ধু প্রহসিতকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যাবলের গুণে অঞ্জনার প্রাসাদে পৌঁছে গেল।

এখানে গভীরভাবে চিন্তা করুন যে চক্রবাকিকার যন্ত্রণা এবং তার বিলাপ দেখে আজ পর্যন্ত কুসংস্কার ও অবজ্ঞার প্রভাবে পবনঞ্জয়ের মনে স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের চিন্তা আসা উচিত ছিল যে, ''চক্রবাকিকার তার সঙ্গীর প্রতি কী গভীর স্নেহ যে শুধুমাত্র রাতে বিচ্ছেদও অসহ্য হয়ে ওঠে। তার জন্য! আজ অঞ্জনা! যে অন্য পুরুষের প্রতি স্নেহ রাখে!'' অনেক মা-বাবা অঞ্জনার নির্দোষতা ব্যাখ্যা করার পরেও এবং হাসির পরেও, পবনঞ্জয়ের কুসংস্কার, যে তাকে মন্দ বলে মনে করে, তা আজ নিজেই দূর করা উচিত, কীভাবে সম্ভব? কিন্তু এটা সম্ভব ছিল। এটি উপযুক্ত যে সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে জেলরের আচরণও পরিবর্তিত হয়েছিল। বন্দি বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেল।

বছরের পর বছর শরীর চেপে বসে, রোগ দূর করার জন্য অনেক চেষ্টা করে, বড় বড় বিশেষজ্ঞ এবং ভারী ভারী ওষুধের পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে, তবুও একই রোগ দূর করতে বিশ্বে সফলতা আসেনি। অনেকবার দেখা যায় যে। প্রতিকার থেকে দূরে চলে গেছে। এমনকী, এই ক্ষেত্রে, মূল ঘটনাটি একই থাকে যে কর্মসত্তা আদালতের দেওয়া শাস্তি পূর্ণ হয়েছে, তাই কারণ যাই হোক না কেন, আত্মা শাস্তি থেকে মুক্তি পায়।

দি. ৮-২-২০০৪-এর গুজরাট সমাচারে, একটি বিদেশি প্রসঙ্গ ছাপা হয়েছিল - এডউইন রোবিনসন নামে একজন ট্রাক ড্রাইভারের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। চিকিৎসার পরও চোখের দৃষ্টিশক্তি চলে গেছে, শ্রবণশক্তিও চলে গেছে। একাধিক ক্ষত, বিভিন্ন চিকিৎসা এবং বিভিন্ন ওষুধের পরে, উচ্চস্বরে শব্দ শুনতে অসুবিধা করার জন্য কানের উপর একটি মেশিন স্থাপন করা হয়। কিন্তু চোখের জন্য স্পষ্ট করে বলা হলো, ভেতরের স্নায়ুতে এমন প্রভাব পড়েছে যে, এখন সারা জীবন অন্ধত্ব থাকবে। এডউইনের বয়স তখন 53 বছর। ড্রাইভিং বন্ধ। হাতে লাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি তাঁর বাড়ির উঠানে একটি ছোট বাগান তৈরি করে এর যত্ন নেন। এভাবেই কেটে গেল নতুন বছর। একদিন তিনি যে গাছের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই গাছে একটা বাজ পড়ে। গাছ ভেঙে পড়ে। গাছ পড়ে এডউইন হতবাক হয়ে পড়েন এবং অজ্ঞান হয়ে যান। বিশ পঁচিশ মিনিট পর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে, তখন তার আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি সবকিছু স্পষ্ট দেখতে এবং শুনতে পান। তার ডাক্তার অবাক হয়ে গেল। বাজ পড়লে কি অন্ধত্ব দূর হয়ে যায়?... বলুন... শাস্তি শেষ... মুক্তি পাওয়া গেছে...।

সেজন্য... যন্ত্রণা সহ্য করে... দুই বছর কেটে গেছে, তিন বছর কেটে গেছে... আর কতদিন কষ্ট সহ্য করব...? যখন এমন ক্ষোভ ও সন্তান মনের মধ্যে জ্বলতে থাকে, মন যখন বিচলিত হয়, তখন আত্মাকে বোঝাতে হয় হে আত্মা! আপনি অধৈর্য কেন? শাস্তির মেয়াদ শেষ হলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কখনও কখনও ভারী অপরাধের কারণে শাস্তি দীর্ঘ হয়, তারপর শাস্তি এমনকী, আজীবন খেতে হয়। এমন পরিস্থিতিতেও প্রতারিত হবেন না, অধৈর্য হবেন না।

প্রশ্ন। কিন্তু আয়ু কম, সাজা যদি বেশি হয়?

উত্তর। তাই শাস্তি পরলোকের সঙ্গে আসে। বহু জন্মে দুর্ভাগ্য, দারিদ্র, দেহের অসুস্থতা চলতেই থাকে। এই ধরনের বহু দৃষ্টান্ত শাস্ত্রের পাতায় লিখিত আছে। তথাপি শাখাত্রবচনের গোপন রহস্য এবং অনেক দৃষ্টান্ত থেকে, যদি আমরা একটি অনুমান করি যে - জীব যদি কঠোরতম অত্যাচারে পরিপূর্ণ শাস্তি মেনে নেয় - অন্য মানুষের অন্যায়, ব্যবধান বিদ্ধ করে এমন শব্দ, হৃদয়ের বিরক্তিকর আচরণ, শারীরিক মানসিক যন্ত্রণা ইত্যাদি এমনকী আমার কাজগুলিও খারাপ, এমন চিন্তার দরজা অধৈর্যকে চেপে রাখতে সফল হয়। মনের এবং নিপীড়িত প্রাণীর প্রতি ঘৃণা এবং শত্রুতা উদ্ভূত। সেই অত্যাচারী প্রাণীর দ্বারা যদি সে মরণশীলভাবে আক্রান্ত হয় এবং মৃত্যু এসেও সে তার সমতা বজায় রাখে, তবে শুধু শত-সহস্র-কোটি বছর নয়, কোটি জন্মের জন্য, অবশিষ্ট শাস্তি ক্ষণিকের জন্য সহ্য করতে হবে। আমি প্রায়শই এটি বাতিল করি, এত বেশি নয়, সেই প্রাণীটিকে একটি দুর্দান্ত পুরস্কার দিয়ে খুব সম্মানজনক জায়গায় বসেছি - সুতরাং সেই অনুমানে কোনও অন্যায় বা আপত্তিকর কিছু নেই।

ঝাঁঝাড়িয়ামুনি, খণ্ডক য়ুরির পাঁচশো শিষ্য, খণ্ডক ঋষি প্রভৃতি অনেক দৃষ্টান্তে দেখা যাচ্ছে যে, অন্যান্য জীবের দ্বারা সৃষ্ট যন্ত্রণাকে সমানভাবে সহ্য করা আত্মস্বার্থের একটি ছোট পথ। আমরা দেখতে পাই যে, বহু বছর ধরে উচ্চ-স্তরের আধ্যাত্মিক সাধনা করেও যে কেবলজ্ঞান প্রকাশিত হতে পারেনি, তা ভালজ্ঞান-উপসর্গ সহ্য করতে গিয়ে সমতা ধারণের প্রভাবে খুব অল্প সময়েই প্রকাশিত হয়।

অর্থাৎ যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা, যে যন্ত্রণা বারবার সহ্য করতে হয়, এবং তাও

বহু বছর সহ্য করেও বাড়তে থাকে, এমনকী, যদি তার শেষ দেখা যায়, তবু সহ্যের পাশ ছাড়ে না। মন খারাপ হতে দেবেন না, সাম্য বজায় রাখুন। ট্র্যাজেডির অবসান ঘটাতে এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়। বরং যাঁরা সকলের কাছে দুঃখ-বেদনার কাহিনি বর্ণনা করেন এবং যাকে দুঃখ দেন তাকে অভিশাপ দেন, তাঁরা অন্য জন্মেও একইভাবে কান্নাকাটি করতে থাকেন।

নানারকম ব্যাখ্যা, নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা এবং শেষ পর্যন্ত রূঢ় প্রতিক্রিয়া... নানাভাবে অনেক চেষ্টা করেও কষ্টকর কষ্ট থামে না, ওপর থেকে আরও পাতা উঠে। মানসিক যন্ত্রণাও ক্রমাগত দিতে থাকে, তাই নিজেকে এই সব সহ্য করার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। যদি ট্র্যাজেডি সহ্য করতেই হয়, তবে কেন তা সমানভাবে সহ্য করা যায় না, যাতে ভবিষ্যতে কোনও এক সময় তার শেষ হয়ে যায়? এটা একেবারেই সত্য যে এমন সময়ে সমতা থাকা অসম্ভব নয়। এবং এটা কঠিন নয়।

এত কঠিন সাম্যকে অবিচল রাখার জন্য আমরা এভাবেও ভাবতে পারি: হে আত্মা! এমন পরিস্থিতিতে সাম্য বজায় রাখাই আপনার জন্য প্রধান সাধনা। যে তপস্বী মাসাক্ষমণের কঠোর তপস্যা করেন, যিনি কর্ম নির্জয় ও আত্মস্বার্থ করতে পারেন, আপনি এই সাম্যের মাধ্যমে বহুগুণ বেশি কর্ম নির্জয় ও আত্মস্বার্থ করতে পারেন। যে দাতা কোটি কোটি টাকা দান করে সে তার চেয়ে বেশি পুণ্য অর্জন করতে পারে, হে আত্মা! আপনি এই সাম্যের মাধ্যমে উপার্জন করতে পারেন এবং আপনি যদি সাম্য না রাখেন তবুও এই দুর্ভোগ কমবে না, আপনাকে এটি ১০০% সহ্য করতে হবে। তাহলে কেন সমতা অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করবেন না?

এছাড়াও এই ধরনের চিন্তা আর্তধ্যানের ক্লেশ থেকে আত্মাকে রক্ষা করতে পারে যে—

হে জীব! কান্নাকাটি করে, ধিক্কার জানিয়ে, যা পেয়েছ তার জন্য অভিযোগ করে, যাকে আঘাত করে তার ক্ষতির কথা ভেবে, প্রতিশোধ নেওয়ার উচ্ছা করে বা মনে শত্রুতার গাঁট বেঁধে, দুঃখ কমবে না, হয় না। বরং ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যে, দীর্ঘকাল আরও বেশি কষ্ট পেতে হবে। এর কারণ হল এটি কর্মসত্তা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ। শাস্তিকে অযোগ্য মনে করার এই অভিপ্রায়, যা কর্মসত্তা কখনও ক্ষমা করে

না। এটাও এ কারণে যে, অনন্তকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। কর্মসত্তা কখনোই এমন ভুল করে না অপরাধীকে কোনো প্রকার শাস্তির সম্মুখীন না করে এবং নিরপরাধের শাস্তি হওয়া উচিত। কর্মসত্তা তার এই সম্পূর্ণ নিরীহ ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত গর্বিত এবং এই কারণে, কেউ যদি এর কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে তবে কর্মসত্তা তা সহ্য করতে পারে না। সে যেন রেগে যায় আর তাই বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে এটা আমার দোষ, যেন তুমি তোমার অপরাধ জানো না তাই আমার দেওয়া শাস্তিকে ভুল বলে নিচ্ছ? এই বলে সে সেই প্রাণীকে আরও শাস্তি দেয়।

অতএব, হে আত্মা! কান্নাকাটি করে লাভ নেই। সমতা বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। আপনার পরীক্ষা হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু সঠিক উপলব্ধি ও আন্তরিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে যদি সে সাহস রাখে, তাহলে সে অবশ্যই এই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হবে। আর কাছে এলে প্রকৃতির প্রিয় হয়ে উঠবে।

অনেকেই অভিযোগের কণ্ঠে আমাদের জিজ্ঞেস করেন, মহারাজ সাহেব! আমরা জীবনে এমন কোনো পাপ করিনি। খারাপ কিছু করিনি, খারাপ কিছু চিন্তাও করিনি। যতটা সম্ভব অন্যের উপকারের জন্য এই ধরনের কাজ করুন। তবু আমাদের জীবনে অনেক দুঃখ আছে। ক্লান্ত স্যার! প্রকৃতির বিচার কী?

এই ভাগ্যবানদের কী বোঝাব?

এক সর্দারজী কোনো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে একটি হাট পড়ল। একটা বোর্ড ছিল আসুন! আমাদের প্রিয় খাবার উপভোগ করুন। আপনার কাছ থেকে বিল নেওয়া হবে না। আমরা আপনার ষষ্ঠ প্রজন্ম থেকে আমরা উশুল করে নেব। বোর্ড পড়ে সর্দারজি খুশি হয়ে গেলেন। ভাবলেন—এখন অন্য কোথাও যাব কেন? তারপর ভাবলেন ষষ্ঠ প্রজন্ম দেখেছেন? হিসাব কে রাখবে আর কে আদায় করবে? বিনা পয়সায় খেতে হবে আর বিনা পয়সায় খেতে হলে আমি একা কেন? স্ত্রী-সন্তানকেও দাওয়াত দেব না কেন? বাড়িতে গেলেন, বউকে বলল, আজ খাবার রান্না কোরো না। আমি তোমাদের হাটে নিয়ে যাচ্ছি, আর আজ কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। যার যতটা খাওয়া দরকার, যতটা খাওয়ার খাও। আমি বারণ করব না। কারণ টাকা দিতে হবে না। সবাই পৌঁছে পেট ভরে ইচ্ছেমতো খেয়ে নিল। হাঁটতে শুরু করলে বিল আসে দুই হাজার টাকা। চমকে উঠলেন সর্দারজি। ধাক্কা আর বিস্ময় নিয়ে তিনি ম্যানেজারের

কাছে গেলেন। বললেন, স্যার! ষষ্ঠ প্রজন্মের কাছ থেকে টাকা আদায় হবে বলে একটা বোর্ড লাগিয়েছেন, তাহলে আমাকে এই বিল দিতে হবে কেন? ম্যানেজার শান্তভাবে উত্তর দিল, এই বিল আপনারা যা খেয়েছেন তার নয়। এই আপনার আগের ছয় প্রজন্ম যা খেয়েছে তার বিল।

হ্যাঁ, আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, এই জীবনে আমরা যা কিছু কষ্ট পাচ্ছি যেমন দারিদ্র, পরাজয়, অপমান ইত্যাদি, তার বেশিরভাগই আমরা সেই একই দুঃখের খেসারত দিচ্ছি যা আমরা পূর্বজন্মে করেছি। এই বাড়িতে আমরা যা কিছু ভাল বা খারাপ করি না কেন, আমরা প্রায়শই তার ভাল বা খারাপ ফল আগামী জন্মে পাব। তাই এই জন্মে যদি পাপ না করো, কারো ক্ষতি না করো, তাহলে তুমি কৃতজ্ঞতার যোগ্য। পরের জন্মে কোনো শাস্তি হবে না... কিন্তু পূর্বজন্মে করা অপরাধের শাস্তি তো এখানেই দেওয়া হবে, তাই না? ভগবান মহাবীরও সেই চরমে কী পাপ করেছিলেন? কে কী করেছে? যারা ভয়ানক করেছিল তাদের জন্যও তিনি করুণার কথা ভেবেছিলেন। তারপরও কত অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে? কেন?

কারণ প্রভুর কাজ কঠিন ছিল...?

প্রভুর কর্ম ছিল কঠিন আর আমরা ছোট!

যে কয়েদি খুব শান্তিতে সাজা ভোগ করেছে এবং কোনো যুক্তি বা প্রতিশোধ ছাড়াই অন্য বিষয়ে অত্যন্ত সৌজন্যমূলক আচরণ করে, সে যদি জেলরকে বলে যে এখানে আসার পর আমি কী অপরাধ করেছি যার জন্য আপনি আমাকে এত শাস্তি দিচ্ছেন? তাহলে জেলর কী বলবে? শুধু তাই নয়, কারাগারে আসার পর আপনি শান্ত থাকুন, ধন্যবাদ। কিন্তু এখানে আসার আগে তুমি যা করেছ তার জন্য তোমাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

এটা কি আমাদের জীবনে আসা দুঃখের মতোই নয়? মহাবীরের সম্বন্ধে প্রভু যে সমাধান দেন তা হল, পূর্বজন্মের কৃতকর্মের শাস্তি ভগবান যা ভোগ করেছেন, আমাদের দুঃখের কথাও তাই ভাবা উচিত নয়? তাহলে অভিযোগ কী ছিল? এটা কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে অপরাধের জন্যই শাস্তি। বর্তমানের না হলে অতীতের অপরাধের কথা।

অনেক বছর আগে, কিছু সময়ের মধ্যে একটি সত্য ঘটনা পড়েছিলাম। যতটুকু মনে পড়ে তাই বলছি...

ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ শাসিত ছিল তখনকার কথা। একজন বিচারক ছিলেন। তিনি একজন বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভোরে ঘুম থেকে উঠে এলিসব্রিজের কাছে সবরমতী নদীর খোলা তীরে ডুব দিতে যেতেন। প্রতিদিনের রুটিন অনুযায়ী ওই দিনও তিনি নদীর পাড়ে গিয়েছিলেন। একই সঙ্গে ব্রিজে একজন নিহত হয়েছেন। রাস্তার আলোর আলোতে তিনি খুন হওয়া লোকটিকে ভালোভাবে দেখতে পেলেন। যোগানুযোগ হত্যার এই মামলা তার কাছেই এসেছে। কিন্তু যে ব্যক্তিকে পুলিশ অভিযুক্তের খাঁচায় দাঁড় করিয়েছে সে অন্য কেউ। তাকে দেখে বিচারক ভাবলেন—এই লোকটিকে মুক্তি দিতে হবে কারণ বাস্তবে খুনি অন্য কেউ।

কিন্তু আশ্চর্য! পুলিশের উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমাণ, সাক্ষীদের কথা এবং তপস্যার সময় আসামির মুখ থেকে বেরিয়ে আসা কথাগুলো... সবই প্রমাণ করছিল ''এই আসামিই খুনি''। বিচারক বিভ্রান্ত হলেন। বিবেক বলে এই লোকটা খুনি নয় এবং কোর্টের ক্রিয়ায় প্রমাণিত হয়েছে যে সে খুনি, তার শাস্তি হয়েছে। কিন্তু আদালতে ন্যায়বিচার হয় না, আইন পালন করা হয়। এমন অবস্থা হয়েছিল যে এই অভিযুক্তকে আইনি প্রক্রিয়া অনুযায়ী শাস্তি পেতে হয়েছিল। কিন্তু নিরপরাধের মৃত্যুদণ্ড...? তাই নিজের বিবেককে কিছুটা আশ্বাস দিতে, কিছুটা সমাধান পেতে আসামিকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

আসামি খুনি ছিল না, তাহলে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কীভাবে গ্রহণযোগ্য হবে? হাইকোর্টে আপিল করেন তিনি। কিন্তু আশ্চর্য...! সেখানে কার্যক্রমের ফলে হাইকোর্টের বিচারক ভাবলেন—এই অপরাধীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কেন? এর ফাঁসি হওয়া উচিত। আর এ জন্য মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টও তার সাজা বহাল রেখেছে। ফাঁসির তারিখও ঠিক করতে হবে। এই ব্রাহ্মণ বিচারকের মন খুব অস্থির ও অস্থির হয়ে উঠল। ''ঈশ্বরের ঘরে দেরি আছে, অন্ধকার নেই'' এমন যে তার দৃঢ় বিশ্বাস বিঘ্নিত হলো। শেষ পর্যন্ত ফাঁসি কার্যকরের আগে কারাগারেই আসামিদের সাক্ষাৎ নেন তিনি। বলল—দেখুন ভাই। আগামীকাল আপনার মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত। আপনার মামলা এখন একটি ফুল স্টপ সঙ্গে চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং এছাড়াও আমি এইবার আপনার কাছে বিচারক হিসাবে নয়, একজন অনুসন্ধানী ব্যক্তি হিসাবে

এসেছি। অতএব, আমরা এখানে যাই কথা বলব না কেন, আদালতের দৃষ্টিকোণ থেকে এটির কোনো মূল্য নেই, আপনাকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে। আপনি যদি এর সাথে একমত হন এবং এই কারণে আমাকে সত্য বলতে প্রস্তুত হন তবে আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই, কারণ আপনার মামলার কারণে আমার মনে অনেক অশান্তি চলছে।

বন্দি জবাব দিল, আমি আপনার সাথে একমত। যাই হোক, আগামীকাল আমাকে মরতে হবে, তাই জীবনের শেষ মুহূর্তে আমি মিথ্যা কথা বলব না, তাই বিশ্বাস রাখুন। এখন যা কিছু জিজ্ঞাসা করতে হবে আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

বন্দির এসব কথা শুনে বিচারক তাকে বলেন, তার দৃষ্টির আগেই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন—এ ক্ষেত্রে আপনি খুনি নন, আমার চোখ তাই বলে। এটা কি সঠিক?

"হ্যাঁ হুজুর! আপনার বক্তব্য সম্পূর্ণ সত্য। এই ঘটনায় আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

বিচারক : তাহলে আদালতে আপনি দোষী প্রমাণিত হলেন কেন? কেন আপনার মুখ থেকে কিছু কথা এমনভাবে বের হল যে আপনি খুনি প্রমাণিত হলেন? আমার দেওয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সহানুভূতিশীলভাবে মৃত্যুতে রূপান্তরিত হলো? আপনি এই সম্পর্কে বলতে পারেন?

অশ্রুসিক্ত চোখে বন্দি বলল, হুজুর! জীবনের শেষ মুহূর্তে, কেউ মিথ্যা কথা বলবে না, পাপ গোপন করবে না। বহু বছর আগে আমি একটি খুন করে নির্দোষ ছিলাম। আমার মনে হচ্ছে আজ সেই অপরাধের শাস্তি পাচ্ছি। এই কথাগুলো ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের প্রতি বিচারকের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করেছিল।

বাস্তব হলো বর্তমান সময়ে আমরা নিজেদের যতই নিরাপরাধ মনে করি না কেন, কিন্তু আমরা যদি শাস্তি পাচ্ছি, তাহলে আমাদের অপরাধ অবশ্যই হবে। বর্তমান সময়ের নয় অতীতের। অপরাধ ব্যতীত কোন শাস্তি হয় না এবং যদি আমাদের অপরাধের শাস্তি হয় তবে যে ব্যক্তি এটি কার্যকর করবে সে জেলর হবে এবং যদি সে জেলর হয় তবে তাকে খারাপ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। তার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার কথাও ভাববেন না।

প্রশ্ন। আমাদের যেমন অপরাধ ছাড়া শাস্তি দেওয়া যায় না, তেমনি অন্যদেরও তাদের অপরাধ ছাড়া শাস্তি দেওয়া যায় না। অর্থাৎ আমরা যদি তাকে চড় মারি, তাহলে আমরাও জেলর হিসেবে গণ্য হব, তাই না? আর জেলের বন্দিকে শিকার দিয়ে মেরে ফেলুক বা অন্য কোনো ধরনের শাস্তি হোক না কেন, তাকে কোনো প্রকার শাস্তি ভোগ করতে হবে না, তাহলে আমাদের কোনো শাস্তিই পেতে হবে না, তাই না?

উত্তর। বিয়ের দু'দিন পরেই মেয়েটি রাগ করে মায়ের বাড়িতে চলে যায়। এখানে বাবা-মা তাঁদের ছেলেকে কারণ জিজ্ঞেস করলেন, ছেলে নিজেও কিছু বুঝতে পারছে না, তাই সবাই নববধূর বাবার বাড়িতে গেল। মেয়েটির বাবা-মাও তাঁদের মেয়েকে জিজ্ঞেস করছিলেন, বিটি, কী হয়েছে যে তুমি রাগ করেছ?

চোখে জল নিয়ে মেয়েটি উত্তর দিল—"তোমার জামাই আমাকে কলঙ্কিত বলে।" সবাই জামাইয়ের দিকে তাকাল, সেও খুব অবাক হল। আমি তোমায় কবে কলঙ্কিত বললাম, সে জিজ্ঞাসা করল। মেয়েটি বলল, তুমি আমায় চাঁদের মতন বলোনি?

মৃদুতা এবং প্রফুল্লতা দেখানোর জন্য প্রদত্ত চাঁদের উপমা একটি কলঙ্কিত অংশে নেওয়া উচিত? মোদ্দা কথা হল, যে কোন ইলাস্ট্রেশনকে যতগুলো অংশে বোঝানো উচিত ততটুকুই বোঝা উচিত। যদি সব অংশে নেওয়া হয়, তাহলে অর্থ হারিয়ে যাবে।

জেলরের দৃষ্টান্তেও একই কথা প্রযোজ্য। কারো পক্ষ থেকে যদি আমাদের কিছু সহ্য করতে হয়, তবে আমাদের সাম্যের কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়, তাই ঝামেলা সৃষ্টিকারীকে জেলের মতো বিবেচনা করে রাগ-বিদ্বেষ ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকতে হবে। কিন্তু আমরা যদি নিজেরা অন্যকে আঘাত করি, আমরা জেলর নই। কর্মসত্তা তখন আমাদের জিজ্ঞাসা করেন কেন আমি তাকে শাস্তি দেওয়ার আদেশ পরিবর্তন করলাম? যদি দেওয়া হয়, তার লিখিত প্রমাণ দাও। আপনি নিজেই বিচারক হয়ে এই শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু শাস্তি দেওয়ার অধিকার শুধু আমারই আছে।

আপনি এতে হস্তক্ষেপ করেছেন, তাই আপনিও শাস্তির যোগ্য, শাস্তি আপনাকে ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ যে আমাদের থাপ্পড় মারছে সেও নিজের

চোখে বিচারক হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এই কাজের শাস্তি সে অবশ্যই পাবে। শুধুমাত্র আমরা, আমাদের সমতার স্বার্থে, তাকে জেলর হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

সংক্ষেপে - কেউ যদি আমাদের হয়রানি করে তবে সে জেলর এবং আমরা যদি কাউকে হয়রানি করি তবে আমরাই বিচারক।

প্রশ্ন। এটা অদ্ভুত না? যদি অন্য কেউ প্রতিকূল আচরণ করে তবে সে জেলর এবং যদি আমরা প্রতিকূল আচরণ করি তবে আমরা বিচারক...!

উত্তর। না এটা বিচিত্র নয়, বরং এটা একান্তবাদ। এটা প্রায়ই ধর্মোপদেশ সর্বত্র ক্ষেত্রে হয়। নিজের জন্য আলাদা নিয়ম, অন্যের জন্য আলাদা। উদাহরণস্বরূপ, কৃতজ্ঞতার জিনিসটি নিন। আমরা যদি অন্যের কোনো উপকার করে থাকি, তবে তা মনে রাখা উচিত নয়। তাকে ভুলে যেতে হবে। যদি অন্য লোকেরা আমাদের উপকার করে থাকে তবে এটি সর্বদা মনে রাখা উচিত, কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

আপনার নিজের ভালোর প্রশংসা করতে হবে না, অন্যের ভালোর প্রশংসা করতে হবে। এরকম অনেক কিছু পাবেন। সুতরাং সারমর্ম হল যে অন্য লোকেরা যদি আমাদের সাথে প্রতিকূল আচরণ করে তবে তারা হল কর্মসত্তা দ্বারা নিযুক্ত কর্মচারী - জেলর, এবং আমরা যদি অন্যদের সাথে প্রতিকূল আচরণ করি, তবে আমরা কর্মসত্তার আদালতের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপকারী অনির্বাচিত বিচারক...

৬. বিড়ালের আশ্রয়ে ইঁদুর

একটি ইঁদুর খুব আঘাত পেল। ইঁদুরটি খুব রেগে গেল। ''হারামখোর! আমি এখন তোমাকে সোজা করে দেব।'' তারপর ভাবল—এক থেকে দুইটা ভালো। কাকে সাহায্য করবেন? আর মনে মনে ঠিক করেই বিড়ালের কাছে সাহায্য চাইতে লাগল। ফলাফল?

মাকড়সার কীটপতঙ্গ থেকে বাঁচতে একটি বিড়ালের সাহায্য নেওয়া ইঁদুরের পক্ষে কতটা অযৌক্তিক, বোকামি এবং বিপর্যয়কর বলে মনে হয়? জ্ঞানীরা বলেন—পার্থিব কোনো ক্ষতির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে হলে আত্মাকে ক্রোধের আশ্রয় নিতে হবে, এটা আরও বেশি অন্যায়, মূর্খতা এবং আরও নিষ্ঠুর, কারণ বিড়ালের কাছে গেলে ইঁদুর প্রাণ হারাবে, মরে যাবে। শুধুমাত্র একবার, ক্রোধের আশ্রয় নিতে গিয়ে যে জীব প্রবেশ করে তাকে তার ক্ষমাশীল, গুণী আত্মা হারাতে হয় এবং দুর্ভাগ্যের চক্রে আটকে পড়ে বারবার মরতে হয়।

হ্যাঁ, যে কোনো পার্থিব ক্ষয়ক্ষতি শুধুমাত্র একটি হাঁসকে ছিটকে দেওয়ার মতো। ক্ষয়ক্ষতি গালাগালি, অপমান, মিথ্যা অভিযোগের আকারে হোক না কেন, কোনো নিবন্ধের ক্ষতির আকারে হোক, পাঁচ হাজার টাকা, পাঁচ লাখ, পাঁচ কোটি বা পাঁচ বিলিয়ন টাকা হোক তা কারও আঘাতের আকারে হোক বা কারো ডেকের রূপ। যে কারো হাত বা পায়ের হাড় ভেঙে গেছে বা কোনো কারণে প্রাণ হারিয়েছে। এই সমস্ত ক্ষতি হল ছারপোকার কামড়ের মত এবং এই ক্ষতির জন্য রেগে যাওয়া বিড়ালের আশ্রয়ে যাওয়া ইঁদুরের মত।

প্রশ্ন। পাঁচ-পঁচিশ টাকার ক্ষতি হলে রাগ করা উচিত নয়, যেতে দিন, ঠিক আছে, তবে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হলেও বা হাত-পা ভেঙে গেলেও রাগ করা উচিত নয়, রাগ বোকামি, এটা কীভাবে উপযুক্ত বলে গণ্য হয়?

উত্তর। রাগ করা - অনাদিকাল থেকে আত্মার অভ্যাস। শুধু ক্ষতি হলেই নয়, ক্ষতির কথা ভেবেই জীব রাগ করে। 'যাও'—সে যেতে দিতে প্রস্তুত নয়।

এবং এই জিনিসটি শুধুমাত্র নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আশেপাশের বিশ্বে, আমরা প্রায় সর্বত্র এটি দেখতে পাই। তাই 'রাগ বোকামি, দায়িত্বজ্ঞানহীন' এই সত্যটা মেনে নিতে মন প্রস্তুত না হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এত রাগ করা বোকামি। হয়! আমরা এই নীতি অস্বীকার বা মুছে ফেলতে পারি না।

একজন অভিবাসী—চপ্পল পরতে ভুলে গেছে। পথে পড়ে থাকা একটি পাথর তাকে সজোরে আঘাত করে। পেরেক বেরিয়ে আসে এবং ব্যথা শুরু হয়। সে ভাবল—''ভালো হয়েছে চপ্পল পরিনি, নইলে চপ্পল ছিঁড়ে যেত।" এটাকে বোকামি বলবেন না কি অন্য কিছু?

সভা—এটি কেবল বোকামি কারণ পা তার নিজের, তার শরীরের একটি অংশ, যেখানে চপ্পল একটি পৃথক জড়বস্তু।

ক্ষতির কারণে রাগের ক্ষেত্রেও একই কথা। কারণ টাকা বা জীবন শেষ পর্যন্ত একটা এলিয়েন জিনিস। একদিন না একদিন নতুন করে ছুঁয়ে যায়। যেখানে ক্ষমা নিজেই আত্মা। স্বর্গের দেবদূতের মতো আরাধ্য রূপ স্বয়ং। বিদেশি বস্তুকে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য, নিজেকে, নিজের আত্মাকে অস্বাভাবিক করে তোলা, ক্ষমাকারী দেবদূতের সৌন্দর্য নষ্ট করা এবং ক্রুদ্ধ রাক্ষসের বর্বরতা অবলম্বন করা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না...

একটি বিশ্ববিখ্যাত প্রবাদের মাধ্যমে এই বাস্তবতা বোঝার চেষ্টা করুন। এই বিশ্ববিখ্যাত প্রবাদটির অর্থ এই তিনটি বাক্য :

সম্পদ হারিয়ে গেলে কিছুই হারায় না।

স্বাস্থ্য নষ্ট হলে কিছু হারিয়ে যায়।

চরিত্র হারিয়ে গেলে সব হারিয়ে যায়।

এই বাক্যগুলির অর্থও সমানভাবে পরিচিত।

ধন-সম্পদ হারালে কিছুই নষ্ট হয় না, স্বাস্থ্য হারালে সামান্য কিছু নষ্ট হয়, পুণ্য নষ্ট হলে সবই নষ্ট হয়।

এটা সত্য, সবাই মেনে নেবে, কিন্তু এমনটা হওয়ার কারণ কী? জীবনে অর্থের চেয়ে স্বাস্থ্য অনেক বেশি মূল্যবান এবং ভালো চরিত্র স্বাস্থ্যের চেয়ে বহুগুণ বেশি মূল্যবান। কিন্তু ধারাবাহিকতায় কেন গুরুত্ব আরও বেশি বিবেচনা করা হচ্ছে? আমার দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর নিম্নরূপ।

এই পৃথিবীতে এমন অনেক শ্রীমন্ত আছেন যাঁরা নিশ্চয়ই যথেষ্ট স্বর্গীয়

সুলতানি দেখেছেন। স্টক মার্কেট প্লেয়ারদের জন্য এটি একটি সাধারণ জিনিস। কোটি কোটি স্বামীর 'ক' কার মুছে যেতে সময় লাগে না আবার আগের জায়গায় ফিরে আসতেও সময় লাগে না। মাল্টিপল-স্ক্র্যাপ ভ্যালু একটি আইসিইউতে ঘুমন্ত হৃদরোগের রোগীর কার্ডিওগ্রাম অনুসরণ করে। এর অর্থ স্পষ্ট। হারানো টাকা এই জন্মে ফিরে পাওয়া যায়, বারবার পাওয়া যায়। যা হারায় তা ফেরত পাওয়া যায়, অচিরেই পাওয়া যায়, হারিয়ে গেলেও কি হারিয়ে যায়? রাত হয়ে গেছে এবং সারা পৃথিবী তার আলো হারায়, কিন্তু কেউ সেখানে বসে কাঁদে না কারণ আগামীকাল আবার আলো আসবে। এ কারণেই বলা হয় ''যদি অর্থ হারিয়ে যায়, কিছুই হারিয়ে যায় না।''

কিন্তু স্বাস্থ্য এমন একটা জিনিস যা একবার হারিয়ে গেলে সারাজীবন আর ফিরে পাওয়া যায় না। অ্যালকোহলের নেশায় আটকে পড়া ব্যক্তি পরবর্তীতে কিছু অনুপ্রেরণা পেয়ে বা অনেক ধরনের বর্জ্য অনুভব করার পর মদ্যপান ছেড়ে দিতে পারে, তারপরও অ্যালকোহলের উপাদান রক্তে মিশে রক্ত দূষিত হয়ে গেছে, আবার বিশুদ্ধ হয়নি। —দোষমুক্ত হতে পারবেন না। প্রচুর খাওয়া-মাওয়ামশালা প্রভৃতি নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি এগিয়ে গিয়ে ত্যাগ করলেও মুখের সংখ্যা ঠিক হয় না। অস্ত্রোপচার না করে যারা শরীরের অংশের জন্য চিকিৎসা করা হয়েছে তাদের জন্য কোনো বিকল্প নেই। আর তখন দানবের মতো চেহারা পেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

প্রশ্ন। যদি তাই হয়, তাহলে 'স্বাস্থ্য হারিয়ে সব হারিয়েছি' বলে কি বলা উচিত?

উত্তর। না, আমরা এ কথা বলি না কারণ হারানো স্বাস্থ্যও পরকালে ফিরে আসে। বলার তাৎপর্য হলো, কাণ্ড নিজেই একটি রোগ যা দীর্ঘকাল ধরে ব্যক্তির শরীরে শিকড় গেড়েছে বা এটি পরিবারের একজন আজীবন সদস্যের মতো আজীবনের রোগ... বিপি, ডায়াবেটিস ইত্যাদি - তাও পরকালে কাউকে সঙ্গ দেয় না। শরীর শিথিল হওয়ার সাথে সাথে শরীরের স্বাস্থ্য সমস্যা দূর হয় এবং আত্মা সুস্থতা ফিরে পায়। সেজন্য বলা হয় না যে, ''স্বাস্থ্য নষ্ট হলে সবকিছু নষ্ট হয়ে যায়''। শুধু কিছু হারিয়ে গেছে! এমনটাই বলা হয়।

এভাবে সম্পদ হারালে কিছুই হারাতে হয় না এবং স্বাস্থ্য হারাতেও কিছু হয় না। অর্থাৎ, এটা বোঝা যায় যে অর্থের চেয়ে স্বাস্থ্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এবং

তাই গুজরাটি ভাষায় প্রবাদটি - পেহেলুন সুখ তে জাতে নারিয়া? অর্থাৎ, একটি সুস্থ শরীর জীবনের প্রথম সুখ, ধনসুখ থেকে তনসুখ (দেহের আনন্দ) ক্রমানুসারে প্রথমে আসে। পেট ভরাট করার জন্য, একজন ব্যক্তিকে যে কোনও ধরনের কাজ করতে বাধ্য করা হয় - মজুরিও, তবে ব্যাগ ভরতে - এমন কাজ করুন যাতে ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়ানো যায় যাতে খাওয়া-দাওয়া এবং ঘুমের সবকিছুই এলোমেলো হয়ে যায়। তিনি কি ইচ্ছার সাথে চিকিৎসা করা হবে? সকালের নাস্তা মুম্বাইতে, দুপুরের খাবার লখনউতে এবং রাতের খাবার দিল্লিতে... এভাবে আজকের ধনী বিশ্ব তাকে বড় শিল্পপতি বলে সম্মানিত করতে পারে, কিন্তু ব্যাস মুনি একটি সুভাষায় এমন নিয়মিত চাকরকে বোকাও বলেছেন। একইভাবে শেয়ারবাজারে কেন এমন অন্ধ দৌড় যে এক ধাক্কায় নিজেকে এমনভাবে আহত করতে পারে যে ক্ষত সারাজীবনের জন্য মুছে যাবে না?

প্রশ্ন। সংসারে সম্পত্তির প্রাধান্য আছে। আর সাহস ছাড়া সম্পত্তি কোথায়?

উত্তর। ঠিক আছে। তবুও স্বাস্থ্যের চেয়ে সম্পদকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। ধরুন ব্যবসায় পঁচিশ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। ব্যবসায় এই লোকসান থাকুক। এটি আপনার মনে প্রভাব ফেলতে দেবেন না। কিন্তু অর্থকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণে মনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে না। এবং এই প্রভাব অবশ্যই B.P. এর উপর। ডায়াবেটিসের মতো চিনিও হাইপারটোনিসিটির মতো রোগের উপহার নিয়ে আসে।

ব্যবসায় আবার সম্পদ আছে, কিন্তু অতিথি হয়ে আসা এসব রোগ দূর হওয়ার নাম নেয় না। এবং কখনও কখনও এমন একটি ধাক্কা হয় যে ব্যক্তি শূন্য-মনের হয়ে যায়। সারাদিন ভাবনায় হারিয়ে গেল। বোকার মত এদিক ওদিক তাকিয়ে থাকো। ২৭-২৮ বছর বয়সি একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী যুবক, সারাদিন বাড়িতেই থাকে, কোনো কাজ নেই, কোনো দায়িত্ব নেই... স্ত্রী এবং পরিবারের জন্য খুব চিন্তার কারণ যাওয়া।

আমার একটা উপাখ্যান আছে.... মহারাষ্ট্রের একটি শহরের জৈন পরিবারের এক তরুণী। অনুশীলনে অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং সমানভাবে পিছিয়ে।

প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রবল এবং পরিশ্রম তা সমান করে দিচ্ছিল। একটি পরীক্ষা আছে। প্রশ্নপত্রও ভালো হয়েছে। মেধাতালিকায় নাম আসবে এবং সেই মেধার ভিত্তিতে আগামীকাল মেডিকেলে ভর্তি হবে। এমন আত্মবিশ্বাস নিয়ে রেজাল্টের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু ফলাফল আসতেই চরম হতাশা তাকে ঘিরে ধরে। যে ফল ঘোষণা হয়েছে তা স্বপ্নেও কল্পনা করা যায়নি। শুধু পাসিং মার্কস! মেডিকেল লাইনে ভর্তির স্বপ্ন ভেঙে গেল। ট্রমা এতটাই গুরুতর ছিল যে তার হাঁপানি (অ্যাস্থমা) হয়েছিল। হাঁপানির প্রথম আক্রমণ এতটাই প্রবল ছিল যে বাড়িতে না নিয়ে সরাসরি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। হাসপাতালে গিয়েও চিকিৎসায় এমন ভুল করেন যে হাঁপানি চিরতরে তাঁর রোগে পরিণত হয়। যখনই এমন অদ্ভুত আকারে হাঁপানির আক্রমণ হয় তখন কিছুই বলা হয় না। দেহের স্বভাব নিজেই বড় অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। আর আইনের অদ্ভুততা বলুন নাকি পৃথিবীর করুণ অবস্থা.....! কাগজপত্র আবার খুলুন, পুনরায় পরীক্ষা করুন.... আসলে বিশেষ যোগ্যতার ক্লাসের নম্বর পেয়েছেন। মার্কশিটে ভুল ছিল। তিনি মেডিকেল কলেজেও ভর্তি হন এবং তিনি ডক্টরেট হন। অনেকের রোগ নিরাময় করে কিন্তু নিজের শরীর? নিজের স্বভাবের প্রতি তার আস্থা নেই। বয়স চল্লিশের বেশি কিন্তু বিয়ে করার সাহস পাচ্ছি না...

আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখুন।

একজন ইংরেজ সাহিত্যিক, জেরেমি টেলর তাঁর নাম। সরস্বতী ও লক্ষ্মী উভয়েরই বরপুত্র। কিন্তু পৃথিবী কি একই গতিতে এগিয়েছে? যে ব্যাঙ্কে তিনি সারাজীবনের উপার্জন জমা রেখেছিলেন তা দেউলিয়া হয়ে যায়। এ খবর জানতে পেরে তাঁর বন্ধু তাকে আশ্বস্ত করতে আসে। কিন্তু আশ্চর্য! এই লোকটি সম্পূর্ণ শান্ত এবং সুখী ছিল। শুধু চোখেই নয়, লক্ষ্মী হাতছাড়া হওয়ায় দুঃখের চিহ্নও ছিল না।

বন্ধু জিজ্ঞেস করল, তুমি কি এখানে দুঃখ পাচ্ছ না? সে উত্তর দিল, দেখো বন্ধু! বাতাস, জল ও কথা বলার সুবিধা আগের মতোই আছে এখনও। আমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ শক্তি এবং সতেজতায় ভরা। আমার হাত-পা আগের মতই শক্ত। দৃষ্টিশক্তি সামান্যও কমেনি। মেষ রাশির জীবন এমন অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। তা ছাড়া আমার শরীরের সামান্যতমও

ক্ষতি হয়নি। তাহলে ব্যাপারটা কী? শিকড়, ডালপালা, শাখা—সবকিছু নিরাপদ। কিছু পাতা ঝরে পড়লে, ঝরে পড়ে... চিন্তার কী আছে?

যা জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়, তা শুধু জীবন হতে পারে, তাই না? জীবন ব্যতীত, সম্পদ, পদ প্রভৃতি বৈষয়িক জিনিসের তুলনায় জীবন অমূল্য, এটি একটি নিশ্চিত জিনিস, এটি ব্যাখ্যা করার দরকার কী? অতএব, সম্পদের জন্য নিজের স্বাস্থ্যকে ঝুঁকিতে ফেলা বা অবহেলা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, এটি একটি পরিষ্কার কথা।

অন্যদিকে, যিনি স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান, তিনি সাধারণত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ পান। অথচ যে স্বাস্থ্য অবহেলা করে সে লাখ-কোটি টাকা নেয় কিন্তু পরে লাখ টাকা খরচ করেও স্বাস্থ্য পায় না। শুধু তাই নয়, সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, বাধ্যতামূলক জীবনযাপন করার সময় এলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। মোটকথা, স্বাস্থ্য ভালো থাকলে অর্থ উদ্ধার করা যায়, কিন্তু অর্থের সাহায্যে আবার স্বাস্থ্য পাওয়া অসম্ভব। এজন্যই বলা হয় স্বাস্থ্য নষ্ট হলে কিছু হারাতেই হবে।

তা ছাড়া অর্থের দ্বারা যে সুযোগ-সুবিধা ও ভোগ-বিলাস লাভ করা যায়, তাই বিশ্বের দৃষ্টিতে অর্থের এত গুরুত্ব রয়েছে। যে ব্যক্তি স্বাস্থ্যহীন, এত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সমস্ত আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকে। পরিবারের সদস্যরা, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুরা তার সম্পদে এবং তার ভাগ্যে আনন্দ করে...?

আপনি বিছানা পরিবর্তন করতে চাইলে একজন বেতনভোগী চাকরের নির্ভরতা—(একটি প্রেমময় স্ত্রী নয়, তিনি একজন শেঠ! তিনি কেবল তার সম্পত্তি নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং সেই সম্পত্তি থেকে তিনি যে শত্রুতা পান!)

খাবারে শুধু চা-দুধ বা মোসাম্বি জুস থাকে এবং তাও এক চামচ চাকরকে মুখে দিলে কিছু পেটে যায়। তাই স্বাস্থ্য হারানোর পর টাকা কাছে থাকলে তা না থাকা সমান। সেজন্য যে স্বাস্থ্য হারায় সে নিশ্চয়ই কিছু হারিয়েছে। কিন্তু আত্মা যদি তার প্রকৃত চরিত্র হারিয়ে ফেলে তবে তা ইহজীবনে ফিরে পাওয়া যায় না, পরকালে পাওয়া অসম্ভব। আবার, জীব যদি অনুপ্রেরণা রায়, তবে সে তা করে (সংকল্প), সে একটি ভাল চরিত্র অর্জনের চেষ্টা করে এবং সেই অনুযায়ী নিরন্তর মহৎ প্রচেষ্টা করে... তবেই তার উপলব্ধি সম্ভব। কিন্তু এর মধ্যে হাজার হাজার, লক্ষ বা অসংখ্য জন্ম হয়। কেউ অসংখ্য জন্ম বা

অনন্তকাল অতিক্রম করলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। তাই বলা হয় চরিত্র হারিয়ে গেলে সব হারিয়ে যায়। আর মাথার চরিত্র হারিয়েছে, মানে জীবটি মন্দ চরিত্রের শিকার হয়েছে। অতঃপর তার কবল থেকে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত বহু দুষ্ট ও দুষ্ট গুণাবলি এবং তার প্রভাবে এমন চিৎকার কর্মে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, ফলে দুর্ভাগ্যের প্রথা এবং তাও প্রতি জন্মে। স্বাস্থ্য এবং সম্পদ।

অগ্নিশর্মা এর জলজ্যান্ত উদাহরণ। এমনকী গুণসেন তার পূর্বাবস্থায় সৃষ্ট ভয়ানক যন্ত্রণা এবং নিজে তাপস হয়ে ওঠার পরও দুই দুই পারানে তাকে পরিশোধ... যে কোনো মানুষের হৃদয় যেন তার সামনে নত হয়, এমন উদারতা-ক্ষমা। কিন্তু তৃতীয় পারানেও যখন পরিশোধ করা হয়, তখন ক্ষমার অনুভূতি অদৃশ্য হয়ে যায়। ক্ষোভের শিকার হন তিনি। গুণসেন ধীরে ধীরে উচ্চ থেকে উচ্চতর দিকে অগ্রসর হয়, সমৃদ্ধির উচ্চতায়, আধ্যাত্মিক সাধনার এবং গুণাবলিতে আরোহণ করে। শেষ পর্যন্ত সমাদিত্যের গৃহে সমস্ত কর্মফল বিনাশ করে মোক্ষ লাভ করে অগ্নিশর্মা! একই জুনওয়ান গুণসেনা-প্রেমময়, নির্দয় জুনসেনের পুত্র, স্ত্রী, ভাই ইত্যাদি রূপে জন্ম নেওয়া, অত্যন্ত কলুষিত প্রকৃতির কারণে অশান্ত জীবন, ভয়ানক বৈরানুবন্ধ অবিরাম বিশ্বাসঘাতকতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি নরকের যন্ত্রণা। সমাদিত্যের মুক্তির পরও পৃথিবী অনন্তকাল পর্যন্ত দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ। এর পরে, ক্ষমাকে আত্মসাৎ করার পরেই আত্ম-উপলব্ধি হয়...

আসুন চণ্ড কৌশিককেও স্মরণ করি.....

তিনি প্রভুর শাসন পাননি, তবুও সেই গোভদ্র ব্রাহ্মণের ব্যক্তিত্ব কত উচ্চ, সুন্দর! আর্থিক অবস্থা খুবই কঠিন হওয়া সত্ত্বেও দক্ষতা ও পুরুষালি স্বভাবে বিভিন্ন শিল্পে অর্জিত সম্পদ।

এটি অর্জনের জন্য বিশেষ কোনো প্রচেষ্টা করা হয়নি। কারণ, তিনি মনের মধ্যে অতুলনীয় তৃপ্তি নিয়ে বেঁচে ছিলেন। সে টাকায় যতটা তৃপ্ত ছিল, যৌনতা উপভোগেও সে তৃপ্ত ছিল। রাতের সময়, অরণ্যের নির্জনতা, দিব্য সমতলের মতো জায়গা, পাশের ঘরে এক তরুণীকে নিয়ে বিলাসে মগ্ন। একই মেয়ের অতুলনীয় সুন্দরী ছোট বোন নিজেই এসে বলে, ‘‘আজ রাতে আমি তোমার স্ত্রী হয়ে তোমার সাথে থাকতে চাই’’, তবুও মন কোনোভাবেই অস্থির বা বিরক্ত হল না। সে তার শালীনতাকে নিখুঁত ও নির্দোষ রেখেছিল, এমনকী যে মেয়েটি তার গর্ব দেখাতে এসেছিল তাকে তার শ্যালিকা বানিয়েছিল। নিজের গুণের

অহংকার নেই, নিজের দোষ নেই, অন্যের কু-প্রবৃত্তির কথা জানার পরও কোনো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য নেই। মহান পরোপকারী ভিক্ষা করার নম্রতা বা অর্থের তীব্র প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিজের শিল্প বিক্রি করার জন্য প্রস্তুত নয়। মান্ত্রিক - তান্ত্রিকের ধ্বংসাত্মক শক্তির কারণে, দুটি অত্যন্ত শক্তিশালী মানব, যারা তাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের কারণে শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য তাদের মনে প্রবল শত্রুতা ধারণ করেছিল, তাদের মন থেকে সেই শত্রুতা দূর করে এবং ধৈর্য ও ক্ষমতা রাখে। পারস্পরিক স্নেহ জাগাও... শ্রী মহাবীরচর্যম গ্রন্থে গোভদ্র ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ পড়লে তাঁর মধ্যে এমন গুণাবলি অনুভূত হয়।

এমন গুণী মানুষ যখন সংযম অবলম্বন করেন তখন কীসের অভাব থাকতে পারে? সৎচরিত্রের মহান বিকাশের সাধনা সফল হয়েছিল। কিন্তু বারবার ব্যাঙের বাচ্চা বলে প্রায়শ্চিত্ত নেওয়ার কথা মনে করিয়ে দেওয়ায় মহারাজ ক্ষমাপ্রার্থনা হারিয়ে রেগে যান। তাই ভবিষ্যৎ জন্মেও শুধু ক্ষমাই নয়, সমগ্র গুণী চরিত্রও হারিয়ে গেল। অবশেষে দৃষ্টি বিশ্বসর্পের জন্ম হল। জীবনের একটাই ধ্যানজ্ঞান, একটাই লক্ষ্য... কোথায় গোভদ্র আর কোথায় চন্দ্র কৌশিকসর্প? কিন্তু করুণাসাগর প্রভু মহাবীর এসেছিলেন। চণ্ড কৌশিককে তার অতীত অভিজ্ঞতার কথা মনে করিয়ে দিলেন। যখন তিনি আবার তাকে ক্ষমার দিকে পরিচালিত করেন এবং তার জন্য মহান প্রচেষ্টা করতে অনুপ্রাণিত করেন, তখন চণ্ড কৌশিক সঠিক পথে আসেন। কিন্তু ভগবান মহাবীর যদি তাঁর সঙ্গে দেখা না করতেন, তাহলে সেই জীবের ঐতিহ্য কী হত?

ভগবান মহাবীরের আত্মা তৃতীয় গৃহে মরীচি রূপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম তীর্থঙ্কর এবং তাঁর পিতামহ ভগবান শ্রীঋষভদেব পরম বৈরাগ্যের সাথে ত্যাগের জীবন গ্রহণ করেছিলেন। করুণাময় সংযম পালনে আত্মাকে মহৎ করেছেন। কিন্তু কিছু সময় পরে সংযমের যন্ত্রণা সহ্য করা কঠিন হবে। বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রকে হারিয়ে ত্রিদণ্ডী রূপ, শিথিলতার লালন গ্রহণ করে। ফলাফল? আবার সৎচরিত্রের প্রাপ্তি ঘটে অসংখ্যকাল পরে ষোড়শতম জন্মে।

এরকম অনেক উদাহরণ আছে। পুণ্য একবার হারিয়ে গেলে, জন্মের পর জন্মের পরও তাদের পুনরুদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন। এবং পুণ্যবান আত্মা দ্বারা প্রাপ্ত আত্মা থেকে কিছু তীব্র পাপের উত্থানের কারণে, সে সেই অবস্থায় স্বাস্থ্য বা সম্পদ নাও পেতে পারে, তবুও পরবর্তী জন্মে সে ক্রমান্বয়ে আরও ভাল অবস্থা লাভ করে। গুণসেন তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর ভবপরম্পরায়, তাঁর

দ্বারা প্রাপ্ত দেবলোকে জন্মগুলি যথাক্রমে ১, ৫, ৯, ১৫, ১৮, ২০, ৩০ এবং তেত্রিশটি সাগরের মতো আয়ুষ্য, যা তাঁর প্রগতিশীল অগ্রগতির নির্দেশক। এবং এই দেবলোকের ভবগুলির মধ্যে প্রাপ্ত মানবজন্মেও তিনি বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় মূল্যবোধের দ্বারা অর্থ উপার্জন করেছিলেন, সেই সম্পদের জোরে, আভিজাত্যের বাসস্থান, উচ্চবিত্তের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা, আধুনিক গাড়ি, পশ্চিমা সংস্কৃতি (বা বিকৃতি!) অনুযায়ী পোশাক, হাসি-ঠাট্টা, কথাবার্তা বা স্পর্শ ইত্যাদি যেখানেই হোক না কেন। সেখানে বিলাসিতার পেছনে জলের মতো টাকা নষ্ট হয়... ভবছেন না যারা হাই-ফাই-এর মতো জীবনযাপনে বিশ্বাসী তাদের আত্মা দলগত শ্রেণিভুক্ত? শুধু বাসস্থান আর আসবাবপত্রের মহিমা দেখছেন? আত্মার মহিমার কোনো গুরুত্ব আছে কি? আত্মার সৌন্দর্য কী?

ব্রিটিশ আমলে এটি ওয়াডালাগাঁও ডুংরি নামে পরিচিত ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর জায়গিরদারদের শাসনের অবসান ঘটে। গ্রামের জায়গিরদাররা ছিলেন দুই ভাই। তাঁরা সময়কে পরীক্ষা করেছিলেন এবং দুজনে আলাদা হয়েছিলেন। দু'জনেই সুখেদুঃখে ওয়াডালা গ্রামকে পূর্বপুরুষের সম্পত্তি বলে ভাগ করে নেন। মাল-সম্পত্তি, জমি, গবাদিপশু, সোনা-রূপা ইত্যাদি সবই যথাযথভাবে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। গ্রামের উপকণ্ঠে একশো বিঘা জমি ছিল। শুধুমাত্র এটি বিতরণ করা হয়নি কারণ বড় ভাই বীর তিরন্দাজির লক্ষ্যভেদ প্রতিযোগিতায় রাজ্য থেকে এই পুরস্কার পেয়েছেন। তাই তিনি এটিকে তাঁর নামে নামকরণ করতে দেন। বড় ভাইয়ের দক্ষতায় তিনি পেয়েছেন, তাই বাপ-দাদার জমি নয়। এই ভেবে, ছোট ভাই রামভাই তাতে ভাগ চাইলেন না। বিশ বছর কেটে গেছে। বীরভাই মারা গেছেন। দুজনের ছেলেই বড় হয়েছে, কাজের দায়িত্ব নিয়েছে। এখন রামভাইয়ের ছেলেরা সেই জমির অংশও চেয়েছে। বীরভাইয়ের ছেলেরা বুঝিয়ে বলল—"এই জমিটা আমাদের বাবাকে পুরস্কার স্বরূপ দিয়েছিল, চাচাও এর থেকে ভাগ চায়নি।"

আমাদের বাবা হয়তো মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা মানি না। শুরু হল আইন আদালত। সাহায্য আসতে থাকে। দুই পক্ষেরই খরচ শুরু হয়। কিন্তু বড় ভাইয়ের ছেলে ছিলেন জ্ঞানী। তাঁরা খুড়তুতো ভাইদের বললেন :

মামলা চালিয়ে গেলে সমস্যা শেষ হবে না এবং উভয় পক্ষই সমস্যায় পড়বে। তাহলে আমাদের অংশ দিয়ে দাও।

আচ্ছা, কাকা যদি বলে তোমাদের জমির অংশ পাওয়া উচিত, তাহলে অর্ধেক জমি তোমাদের।

তিনি তো তাই বলেন।

কোর্টে এসে আমাদের সামনে বলতে হবে।

তখন আবার অন্য কথা বলবে না তো?

ঈশ্বরের দিব্যি তখন অন্য কথা বলব না।

রামভাইয়ের ছেলেদের আনন্দের সীমা ছিল না। মামার এই ছেলেদের বুদ্ধিনাশ হয়েছে। এটা ঈশ্বরের কৃপা। মতিভ্রম হয়েছে। আমরা অন্তত পাঁচ লাখ টাকা পাব।

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে সেই জমির মূল্য ছিল দশ লাখ, আয় হয়তো দশ কোটি টাকারও বেশি হতে পারে। মনের মধ্যে ছিল আনন্দের সাগর। তিনি গ্রামে এসে লোকদের জানান। সবাই খুব অবাক হল। বীরভাইয়ের ছেলে ভুল করছে। আজকের কলিযুগে কারও প্রতি এমন বিশ্বাস রাখা কি ঠিক? দু-চারজন এমনও জিজ্ঞেস করল - কাকা কি বলবেন অর্ধেক ভাগ দিয়ে দেব?

হ্যাঁ, তবে কাকার প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে।

রামভাইয়ের ছেলে মায়ের কাছে এসে বলল, মা, অর্ধেক ভাগ পেয়েছি।

মা : কী, কেস জিতে গেছ?

ছেলে : না, আমি এখন জিতব। এবং সবকিছু মাকে বুঝিয়ে বলল। তারপর বলল—মা!

তুমিও বাবাকে রাজি করাও যাতে আমরা ভাগ পাই।

কিন্তু মা বললেন, ‘‘আমি তাকে কিছু বলতে পারি না কারণ আমি আজ পর্যন্ত তার সাথে এমন বিষয়ে কোনো কথা বলিনি।’’

ঠিক আছে! বলতে হবে না এই বলে ছেলেরা বলে বাবার কাছে গেল। তাঁকে সবকিছু বুঝিয়ে বলল। রামভাই হাসেন। ভাবেন ভাইপোরাও তো বড় হয়ে গেছে। আমাকে সাক্ষী করেছে...!

ছেলেরা জোর দিয়ে রামভাইকে বলল—

বাবা, তোমাকে কোর্টে আসতে হবে।

"আমাদের দুই ভাইয়ের কেউই কোনোদিন কোর্টে যাননি।" বাবা জবাব দিলেন। কিন্তু ছেলে হার মানার পাত্র নয়। সে বলল—

তা হলেও এখন আসতে হবে।

ঠিক আছে, তোমরা দুজনে এত করে বলছ আর ওরা আমাকে সাক্ষী বানিয়েছে, তাহলে তো আমাকে যেতেই হয়? তিনি ভেবেচিন্তে উত্তর দিলেন। দুজনেই খুব খুশি হয়। বারবার বাবাকে রাজি করায় নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে এবং বাবাকে পরীক্ষাও করেন। এখন তাহা তাদের জয় নিশ্চিত বলে মনে করেন। কেসের তারিখ এসে যায়। সবাই কোর্টে পৌঁছে যায়। অপরপক্ষের আইনজীবী রামভাইকে সাক্ষী হিসেবে হাজির করেন। এসে দাঁড়ান রামভাই সাক্ষীর কাঠগড়ায়। খুশিমুখে ধর্মগ্রন্থ ছুঁয়ে সত্য কথা বলার শপথ নিলেন। দুই ছেলেই খুব খুশি। জাঠতুতো ভাইদের দিকে তাকিয়ে তারা ভাবে, আমাদের পকেটে পাঁচ লাখ টাকা এসেছে। বীরভাইয়ের দুই ছেলেই চিন্তিত ও শঙ্কিত। কাকার পুত্রশোকের পাল্লা ভারী হয়ে না যায়।

অভিযোগকারীর আইনজীবী প্রশ্ন করেন - সম্পত্তি যখন ভাগ করা হয়েছিল, তখন এই জমি ভাগ করে দেওয়া হয়নি?

রামভাই - করা হয়নি।

উকিল - আপনারও এতে অংশ আছে, এটা কি সত্যি?

ভাবনায় পড়ে গেলেন রামভাই। কিছু বললেন না।

উকিল - উত্তর...।

রামভাই—ভেবে ভেবে উত্তর দেব? এটা কোনো সহজ বিষয় নয়। আর আজ আমাদের বংশের লড়াই।

উকিল - আপনি যদি সত্য বলেন তাহলে বিরোধের অবসান হবে কারণ আপনি যা বলবেন তা উভয়পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য।

রামভাই দুই মুহূর্ত নীরবতা পালন করলেন, তারপর বললেন—'এই জমিতে আমাদের কোনো অংশ নেই। আমাদের কাছে ভাগ চাওয়ার কোনো অধিকারও নেই।' তার দুই ছেলে যেন আকাশ থেকে পড়ে। রাগে জ্বলন্ত চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল বাবা! আমাদের তরী তুমি তীরে এসে ডুবিয়ে দিলে?—

তোমরা তো জাহাজটা ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিলে। আমাদের সাত প্রজন্মের

সুনাম সততাকে মাত্র পাঁচ লাখ টাকার বিক্রি করতে রাজি হয়েছিলে। কিন্তু আমি কীভাবে এটা এভাবে নিলাম হতে দিতে পারি? শুধু আমাদের গ্রাম নয়, আশেপাশের সব গ্রামে আমাদের পরিবারের প্রতি যে বিশ্বাস আছে, তা অটুট ছিল এবং থাকবে।

সত্যিকারের হাই-ফাই জীবন ঠিক এইরকম। কারণ, জীবন জীবের অন্তর্গত, বাসস্থানের নয়... এবং এটিই আত্মার মহিমা। ইহা পুণ্যময় এবং সেই বৈষয়িক ধনসম্পদের চেয়ে কোটি গুণ বেশি মূল্যবান, ইহা অতি মূল্যবান - ইহা অমূল্য।

এভাবে পুণ্যের চেয়ে পৃথিবীতে আর কিছু নেই, এমনকী জীবনও নেই। এই কারণে বিনয় সমস্যায় পড়লে মহাসতীরা প্রাণ বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেন না। এভাবে যাঁরা শালীনতা রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁদের আত্মার কোনো ক্ষতি হয় না, বরং এর অপরিসীম উপকার হয়, কারণ জীবন উৎসর্গের মাধ্যমে যে বিনয় সম্পাদিত হয় তার মূল্যায়ন প্রকৃতি অত্যন্ত উচ্চ মূল্যায়ন করে। যে বৈষয়িক সমৃদ্ধি দিয়ে একজন ব্যক্তি আত্মাকে ত্যাগ করে গুণে সমৃদ্ধ হয়, তার চেয়ে বেশি সমৃদ্ধি উচ্চ শ্রেণির গুণে, জীবন প্রকৃতি সেই ব্যক্তিকে দান করে।

শালীনতা, পুণ্য ও পুণ্য রক্ষার জন্য সম্পত্তি, পরিবার, সময় বা দেহ যা কিছু ত্যাগ করতে হয়, যদি কুরবানি করা হয়, তাহলে সেই চুক্তি জীবের জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং কল্যাণকর প্রমাণিত হয়।

এই সমস্ত কিছু থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে সম্পদের চেয়ে স্বাস্থ্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যের চেয়ে যৌনতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই লোকসান পাঁচ-পঁচিশ টাকা, পাঁচ-পঁচিশ লাখ বা পাঁচ-পঁচিশ কোটি টাকারই হোক না কেন তা একটা ছারপোকার কামড়ের সমান। আর রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ইঁদুরের বিড়ালের আশ্রয়ে যাওয়ার মতো।

প্রশ্ন। তার মানে পাঁচ থেকে পঁচিশ লাখ টাকা ক্ষতি হলেও কিছু করার নেই, হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। যদি ক্ষতি হয়, তা হতে দিন।

উত্তর। জ্ঞানী ব্যক্তিরা এমনকী, সঠিক প্রকাশ্য আচরণ নিষেধ করেন না। লেনদেন সম্পর্কে - 'এমনকী, কারও কাছ থেকে যে পরিমাণ নিতে হবে তাও জিজ্ঞাসা করবেন না', তারা তাও বলবে না।

প্রশ্ন। কিন্তু সুস্থতার জন্য কিছু কঠোরতা প্রয়োজন এবং কঠোরতা করলে রাগও আসে।

উত্তর। এত স্বত্ব থাকলে সংগ্রহ বন্ধ করুন। আপনার টাকা আসতে থাকলে আসবে, না এলে পাঁচ থেকে পঁচিশ লাখ টাকা ক্ষতি হতে পারে। আমার ক্ষমা বজায় রাখার জন্য - ক্ষমার অবিচ্ছিন্ন শক্তির জন্য আমি সম্পত্তির ক্ষতি সহ্য করতে প্রস্তুত। আমার রাগ করা ঠিক নয়। সম্পত্তি হারানোর পরেও যদি আমি ক্ষমা অটুট রাখি, তবে প্রকৃতি আমার প্রশংসা করবে।

প্রশ্ন। কিন্তু এত পদার্থ না থাকলে কী হবে? আর যদি আমরাও কারও কাছ থেকে ঋণ নিয়ে থাকি আর সেই ব্যক্তি পাঠানোর মতো টাকা চাইছে এবং শুধু আমাদের নয়, পুরো পরিবারকে কষ্ট দিচ্ছে?

উত্তর। এ কারণে জ্ঞানীরা এ ধরনের অর্থনৈতিক আচরণকে নিষেধ করেছেন। ''অন্য লোকের টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করতে এবং যদি কিছু ভুল হয়ে যায়, আপনি যদি আপনার সমস্ত অর্থ ব্যয় করেন, তবে দেউলিয়া ঘোষণা করুন এবং জনগণের অর্থ ব্যয় করুন'' এটি আমাদের সংস্কৃতি নয়, পশ্চিমের বিকৃতি। তারপরও, তারা এমন পরিস্থিতিতে আটকে পড়ে এবং এর কাছ থেকে টাকা চাইতে গিয়ে রেগে যায়, তারপরও কখনও বিশ্বাস করবেন না যে এটি রাগ করার মতো। তার মনে একটা আবেগ থাকা উচিত। অবসর সময়ে চিন্তা করুন।

আমি গন্ধ পেতে চন্দন পোড়াচ্ছি।

আমি একটি পেরেক পেতে পুরো প্রাসাদ ধ্বংস করছি।

হে জীব! মতভেদ মিটে না যাওয়া পর্যন্ত ধার দেওয়া টাকা ফেরত আসবে না। তাহলে কেন সে রাগ করে তার ক্ষমার গুণ নষ্ট করছে?

হে জীব! সাবধান, রাগ যেন শত্রুতায় রূপ না নেয়। ঋণখেলাপির অন্যান্য সমস্যা দেখে আনন্দ নেবেন না। তাকে ধ্বংস করার হুমকি, ভুল করেও এমন দুষ্ট লোকের সাহায্য নেওয়ার কথা ভাববেন না। তার কল্যাণের জন্য একইভাবে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন।

কড়া কথায় টাকা চাওয়ার পরও টাকা ফেরত দেন না, একবার রেগে গেলেন, দ্বিতীয়বার করলেন, প্রতিবারই করতে থাকলেন আর রাগ এমন একটা জিনিস যে রাগ করলেও আপনার কাজ শেষ হয় না, তাহলে তার

পরিমাণ বেড়ে যায়। তারপর প্রতিবারই একই রাগ আকাশ ছুঁয়ে যায়, সাহসও হয় না। এই সময়ে সম্পত্তি বহুবার এসেছে, বহুবার গেছে। (আশ্চর্যের বিষয় যে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার পরেও তিনি আটকে পড়া টাকা ফেরত পেয়েছেন। আপনার হাতে আসা মাত্রই প্রশ্ন জাগে—এখন কোথায় লাগাব? আরে ভাই! যদি কোথাও লাগাতেই হতো, তো কোনো না কোনো জায়গায় তো লাগানো ছিল। কেন আপনি তাদের সেখান থেকে বের করে আনলেন?) অর্থাৎ, সম্পত্তির চেয়ে ক্ষমা বেশি গুরুত্বপূর্ণ... এবং এর জন্য আপনাকে যতই ক্ষতি সহ্য করতে হবে না কেন, সেই ক্ষতি হতে দেবেন না। রাগ এবং শত্রুতার কারণ।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের বুঝতে হবে যে ক্ষতি এবং লাভের বাজার আলাদা নয়। বাজারে লাভ—দোকানে ও ঘরে কোনো লোকসান নেই। যেখানে লাভ আছে, সেখানে লোকসানের সম্ভাবনা রয়েছে। তেমনই ক্ষমা ও ক্ষোভের বাজার আলাদা নয়। রাগের সুযোগ হল ক্ষমার সুযোগ। আমরা অন্য ব্যক্তির আচরণ এবং স্বভাবের উপর রাগ করি, এই ধরনের আচরণ এবং প্রকৃতির উপর আমাদের পূর্ববর্তী মহর্ষিরা ক্ষমা করেছিলেন।

কেউ অপমান, অসত্য অভিযোগ, কঠোর শব্দ উচ্চারণ, আমাদের গালমন্দ, কিছু ভেঙে, থাপ্পড়, আমাদের টাকা প্রতারণা, আমার ক্ষোভের কারণ হিসাবে অন্য মানুষের এই ধরনের কাজ বলা। কিন্তু প্রকৃতি এই সমস্ত কর্মের কোনোটিই গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়, এমনকী, একটি কাজকেও রাগের কারণ হিসাবে গ্রহণ করে। তিনি প্রতিটি কাজকে ক্ষমার হাতিয়ার বলে মনে করেন।

যদি একটি মাত্র ব্যক্তি বারবার আমাদের কষ্ট দিতে থাকে এবং তার কারণে আমাদের ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তবে তার কার্যকরী বর্ণনার মাধ্যমে আমরা অন্যদের বিশ্বাস করাতে পারি যে সারা বিশ্ব বলবে - ‘‘যদি আপনি এত দুঃখী হন তবে আপনি পাবেন। রাগান্বিত! এটাই স্বাভাবিক।’’ তারপরও কর্মসত্তা এই ক্রোধকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয় না। তিনি বলেন যে যা কিছু সহ্য করতে হবে তা ক্ষমার কারণ। ক্ষমা গ্রহণ করতে হবে। তোমার রাগ করার অধিকার নেই।

কত সহ্য করেছিলেন অগ্নিশর্মা! প্রথমে হাসি, তারপর কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর তারপর তিনবার তার পারানা মিস হলো।

এখন নিজেকে আগুনের জায়গায় রেখে ভাবতে হবে। খুব যত্ন, যার জন্য এটা রাখা খুবই জরুরি, ‘‘আমি কোনো কাকতালীয় কোনো দুর্ঘটনা ঘটাতে দেব না! যে ব্যক্তি মনের মধ্যে দৃঢ় সংকল্প করে ফেলেছে, এমনিতে যে ব্যক্তি ভয়ানক নিষ্ঠুর রসিকতা করে হৃদয়কে বড় দুঃখ দিয়েছে, সেই ব্যক্তিকে একবার শিকড় দিয়ে কষ্টের কারণ বলা উচিত। দ্বিতীয়বার শক্ত ঘাঁটি বাড়িয়ে হঠাৎ যুদ্ধের পরিস্থিতির কারণ জানান। এবং তারপর তৃতীয়বারের জন্য একটি জগাখিচুড়ি করা, আমরা কীভাবে এই ধরনের একজন ব্যক্তির জন্য চিন্তা পেতে পারি? কখনোই এদিক-ওদিক আর মাথাব্যথা শুরু হয়নি একই দিনে? তারপর একমাস পর হঠাৎ পারানের দিনে যুদ্ধ শুরু হল? অভিযোগ স্রেফ ভান এবং যুদ্ধও একটি স্টান্ট। পারানা পাওয়ার সুবিধা দেওয়ার অনুরোধ, তার জন্য অনেক অনুরোধ, পারানা হারিয়ে যাওয়ার জন্য চরম দুঃখ এবং অনুশোচনা, অশ্রুর স্রোত—এগুলি কেবল একটি ছলনা ছিল। পারানা ফিরে আসার অনুরোধ মেনে নিয়ে পরাকে মিস করার পর তাকে বিরক্ত করার ষড়যন্ত্র। মনে কী এমন ভাবনা জাগবে? আর এমন ভাবনা জাগলে শুধুই রাগ জাগে, তাই না? শুধু আমরাই এমন অনুভব করব নাকি সাধারণভাবে কোনো মানুষেরই এমন অভিজ্ঞতা হবে? গুণসেনার কারণে অগ্নিশর্মাকে সহ্য করতে হয়েছিল, এবং পরাণ করার সুযোগ না পেলেও দুবার এবং তপস্যার সময়কাল বেড়ে গেলেও তিনি তার সমতা বৃদ্ধি করেছিলেন। এত কিছু হওয়ার পরও তৃতীয়বারের মতো গুণসেনা পাস করেনি। এত সমস্যা সহ্য করার পরও যে রাগ করা হয়েছে তাও কর্মসত্তা মেনে নেয়নি। আর সেই ক্ষোভকে অপরাধ মনে করে এর জন্য কড়া কথা বলা হয়েছে।

ব্যক্তিগত শত্রুতা মেটানোর জন্য পালক রাজার মনে অন্যায় কথা স্থাপন করে শাস্তির অধিকার পান। খণ্ডকাসুরিত ও তার পাঁচ শতাধিক শিষ্যকে ঘানিতে জীবন্ত পিষে ফেলার জন্য একটি যান্ত্রিক ঘানি প্রস্তুত করা হয়েছে। সম্পূর্ণ নিষ্পাপ জীবনপ্রেমী চারশত নিরানব্বই শিষ্যকে পিষ্ট করা হয়। এবার অবশেষে কনিষ্ঠ সুকোমল বাল মুনির পালা।

খণ্ডকসুরি পালককে অনুনয় করে বললেন, ‘‘ভাই, এই বালমুনিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে দেখা আমার পক্ষে অসহ্য হবে। তাই আগে আমাকে একটা বড়ি দাও, নিজের জীবন শেষ করে দাও। এমনকী এই ধরনের একটি সহজ অনুরোধ পিতামাতার দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। তিনি বালামুনিকে তার

সামনে জলে এবং পরে খণ্ডক মুনিকে বসিয়ে দেন। পালক পিতার এমন জঘন্য নৃশংসা দেখে কর্মসত্তাও ক্ষমা করেননি খণ্ডক সুরির ক্রোধকে। এজন্য তাদের কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

কুরুট-উৎকুরুট দুজন মুনি বন্ধু ছিলেন। কঠিন তপস্যা এবং বিশুদ্ধ আত্মনিয়ন্ত্রণের কারণে তিনি অনেক কৃতিত্ব অর্জন করেন। কুনালা যথাক্রমে এসে সেখানে চাতুর্মাস করার সিদ্ধান্ত নেন। যোগানুযোগ মেঘরাজা ক্ষিপ্ত। এক ফোঁটা জলও বৃষ্টি হয় না। আকাশে সামান্য পরিবর্তনও দেখা যায় না। অজ্ঞ লোকেরা অযৌক্তিক ভুল অনুমান করতে থাকে। এই সাধুরা তাদের শক্তি দিয়ে বৃষ্টিকে বেঁধে রেখেছে। সবে মহাত্মাদের অত্যাচার শুরু করেছে। কেউ রাগান্বিত কথা বলে, কেউ গালিগালাজ করে, কেউ কেউ ধাক্কাও দেয়। কিন্তু... মহাত্মা নীরব ছিলেন এবং তাঁর সাধনায় মগ্ন ছিলেন। কোনো সময় কোনো প্রতিশোধ নয়, এমনকী, অভিযোগের একটি শব্দও নয়। সব কিছু সমানভাবে সহ্য করেন। সময় এগিয়ে চলে, মানুষের ত্রাসও দিন দিন বেড়ে চলে। কেউ এসে থুতু দেয় আবার কেউ থাপ্পড় দেয়। সময় আরও এগিয়ে চলে। এখন মানুষ স্বৈরাচারী হয়ে গেছে। সন্ন্যাসীদের সহ্য ক্ষমতাকে তাঁদের কাপুরুষতা-অসহায়ত্ব মনে করে, তাঁদের মারধর করে। রক্তের স্রোত বয়ে যায়। শুধু... মেঘরাজা ডেকেছে পনেরো দিন রাত-দিন বৃষ্টি। সফল মহাত্মাদের কথা নিষ্ফল হবে না। গোটা রাজ্য ভেসে যায়। জলে ডুবে যায় এবং সকলের সঙ্গে এই উচ্চশ্রেণির অন্বেষীরাও নরকে নিমজ্জিত হয়ে নরকে পৌঁছায় - সপ্তম নরকে তাদের কর্মসত্তা পৌঁছেছিল। কর্মসত্তা তার রাগকে ক্ষমা করেনি।

কর্মশক্তি খুবই স্পষ্ট। সে বলে—

আমাকে বিচার করতে হবে, সে কাজ দুনিয়ার নয়। এমনকী, সারা বিশ্ব যে ক্রোধকে ক্ষমার যোগ্য মনে করে তাও আমার আইনে ক্ষমাযোগ্য নয়। আমার আইনে, রাগ কেবল ক্ষমার অযোগ্য।

প্রশ্ন। কিন্তু অন্য কেউ যদি আমাদের রাগ করতে প্ররোচিত করে?

উত্তর। আমাদের চিন্তা করার অধিকার নেই—অন্য মানুষ কী করে তা দেখার। আমি এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে একথা বলার অর্থ স্পষ্ট করব।

বি.সং আমাদের ২০৩৮ সালের চাতুর্মাস ছিল পালনপুরে। গুরুদেব বিজয় ভুবনভানুসুরিশ্বরজী মহারাজ সাহেব পরিবার পালনপুরের বিহারে ছিলেন।

মাঝখানে একটা মধ্যবিত্ত শহর এল। সেখানে এক বৃদ্ধ আচার্য তাঁর বিশাল শিষ্য পরিবার নিয়ে অবস্থান করছিলেন। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায়, স্ব-শ্রদ্ধেয় গুরুদেবশ্রীও নির্মাণ করাতে খুব পারদর্শী ছিলেন এবং তিনিও এতে আগ্রহী ছিলেন। গুরুদেব মহাত্মার বৃদ্ধ ও গুরুতর শারীরিক অবস্থার সমাধির জন্য আট-দশ দিনের জন্য সেখানে বসার সিদ্ধান্ত নেন। সেখানে অল্পবয়সি সন্ন্যাসীও ছিল যাদের বয়স প্রায় বিশের কাছাকাছি। গুরুদেব ছিলেন শাসনে নিবেদিত একজন আচার্য। নিজের বোধের অনেক উপরে! ''এই সাধুরা আমার শিষ্য নাও হতে পারে, কিন্তু তারা আমার শাসনের সাধু। আমরা যদি কিছু অধ্যয়ন করি, তাহলে জৈন শাসনকে আরও উজ্জ্বল করবে।'' এমন উচ্চাভিলাষী মনোভাব নিয়ে তিনি তাকে অনুশীলন করার সিদ্ধান্ত নেন। শাস্ত্রের রহস্য বোঝার জন্য যুক্তিশক্তির প্রয়োজন। এবং যুক্তিশক্তি বিকাশের জন্য, সাধারণভাবে, ন্যায়দর্শনের গ্রন্থগুলি এখানে অধ্যয়ন করা হয়। কিন্তু ন্যায়দর্শনের প্রাথমিক সংজ্ঞা এতই কঠিন এবং বুদ্ধির প্রয়োগ করা যে ছাত্ররা ব্যায়াম করতে লেগে থাকে। হয়তো লাঠি না দিলেও পরবর্তী চর্চা এবং দরবার দর্শনের পাঠ অবশ্যই দুর্গম মনে হয়। পূজ্য গুরুদেবশ্রী একজন আইনজ্ঞ। ন্যায় গ্রন্থের পুনঃব্যাখ্যা করার পর তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন - ন্যায়ভূমি। আমাদের পণ্ডিতরা শত শত বছরেও যে সরলতা আনতে পারেননি, আপনি এখানে যে বইটি উপস্থাপন করেছেন তা দেখে বারাণসীর মহান পণ্ডিতরা অবাক হয়েছিলেন।

গুরুদেব স্বয়ং সেই তরুণ ঋষিদের বললেন, আমার এখানে আট-দশ দিন অবস্থানের সময় আমি তোমাদের ন্যায়ের পাঠ ব্যাখ্যা করি, যাতে পরবর্তী গ্রন্থগুলি সহজ হয়। শ্রী সংঘে, আপনি কীভাবে এত বড় ঋষি এবং স্বয়ং এত বড় মহাত্মাকে না বলতে পারেন? অনুশীলন শুরু হল। কিন্তু আমাদের জুরদেবের প্রতি শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধার সাথে আচরণ না করে, যেন তার সহজাত বিদ্বেষ ছিল না, সেভাবে তিনি অদ্ভুত ও ঘৃণার আচরণ করতেন। এটা দেখে আমাদের ঋষিরা মনে কষ্ট পেতেন। একদিন তিনি আরজ করলেন, গুরুদেব! আপনি একজন অসহায় সন্ধানী। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছাব্বিশ ঘণ্টা কাজ করা আপনার নীতি যাতে এক মিনিটও নষ্ট না হয়। এত ব্যস্ততার মধ্যেও আপনি কোনো না কোনোভাবে মহাত্মা অনুশীলনের জন্য সময় বের করছেন, কিন্তু সেগুলোর কোনো মূল্য নেই। এই লোকেরা উপর থেকে আপনাকে বদনাম

করার জন্য এমন অদ্ভুত আচরণ করতে থাকে। তাই তাদের শেখানো বন্ধ, তাই না? কেন আমরা তাদের শেখানো প্রয়োজন? এই কথাগুলো শুনে গুরুদেব যে কথাগুলো বলেছেন তা আমাদের অন্তরে খোদাই করা উচিত। তিনি বলেন, যখন তিনি তার কাজ করতে বসেন, তখন তিনি দেখেন না কে আমাদের সাথে এমন আচরণ করেছে। সে দেখে আমরা কী করেছি?

হ্যাঁ, এটি খুব ভালোভাবে বোঝার মতো বিষয়। কর্মসত্তা যখন আমাদের ফাইল খুলে বসে, অন্য কোনো ফাইল খোলে না। কর্মসত্তা যেন বলে—অন্যরা কী করেছে, তার ফাইল খুললেই দেখব। এই সময়ে শুধুমাত্র ফাইল খোলা হয়েছে। এতে আপনার রাগ দেখা গেলে, তিক্ততা দেখলে এবং ক্ষমার দৃষ্টি থাকলে আপনি বিশাল পুরস্কার দেবেন।

গুণসেন বারবার অগ্নিশর্মাকে নিষ্ঠুর উপহাস করেছেন। তিনবার পারনা চুরি হয়েছে। কিন্তু কর্মসত্তা যেন অগ্নিশর্মাকে বলছে : গুণসেনের ফাইলগুলো নিশ্চয়ই আলমারিতে কোথাও ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। এই সময়ে আমার হাতে আপনার ফাইল আছে। আর তার মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধ, শত্রুতার তীব্র গাঁট, গুণসেন হত্যার নীতি - গৌরব হত্যার পুণ্য... এসবই দেখা যায়। এই সব একটি অপরাধ। শাস্তি হিসেবে অনন্তকাল পর্যন্ত নরক প্রভৃতি ভয়ংকর অত্যাচার সহ্য করতে হবে। আমি পড়ব এবং ভাবব গুণসেন কী করেছে শুধুমাত্র যখন তার ফাইল খোলার সময় আসবে।

এটা একটা সহজ ব্যাপার। যখন লাভ-ক্ষতি হিসাব করতে হয়, তখন ব্যবসায়ী তার নিজের হিসাব-নিকাশের বই পরীক্ষা করে। প্রতিবেশী দোকানদার কতটা লাভ বা ক্ষতি করেছে বা তার গল্প কী বলে?

হাসপাতালে ভর্তি রোগী কি আগ্রহী? আমার ডান পাশে ঘুমন্ত রোগীর ফাইলটি কী বলে বা বাম পাশে ঘুমন্ত রোগীর ফাইলটি কী বলে বা আমার নিজের ফাইলটি এতে কী বলছে? তার ফাইল হাতে নেওয়ার পরও তার সমস্যা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা তাকে কাছের রোগীর ফাইলের কথা বলতে শুরু করেন, তাহলে ব্যথা কি বিরক্ত হবেন?

এমনকী, আমাদের ফাইলের মধ্যে, যে পৃষ্ঠায় আমাদের ভাল কাজের কথা লেখা আছে, সেই পৃষ্ঠাটি আসার সঙ্গে সঙ্গে, কর্মসত্তা অন্য কোনো প্রাণীর ফাইল তুলে নেয় এবং আমাদের সোনার চিহ্নযুক্ত লেজগুলিকে অমান্য করে,

যদি আমরা সেদিকে মনোযোগ না দিই, তাহলে আমরা সহ্য করব? তাই কর্মসত্তা বলছে - যখন ফাইল হাতে নিয়েছ, তখন একই ফাইল দেখতে হবে, তারপর অন্যের ফাইল দেখবেন না।

সেজন্য তার সামনে যদি আমরা আমাদের পক্ষ রাখি, যদি আমরা এই কথা বলি - তিনি আমাকে কীভাবে গালি দিলেন, কীভাবে তিনি আমাকে আঘাত করলেন, এমন হৃদয়বিদারক কথা বলেন! তাই এসব কথার কোনো অর্থ নেই। কর্মসত্তা বলে—অন্যের ফাইল না খুলে, নিজের ফাইল ভেবে, কী করলেন?

বন্দির দৃষ্টান্তের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি চিন্তা করি, তাহলে যে ব্যক্তি নকল, লাঞ্ছনা বা কোনো প্রকার ঝামেলা দেয়... তারা সবাই কর্মসত্তার কারাগার।

বিচারকের আদেশ অনুযায়ী জেলর অপরাধীকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দেন বা আদালতের আদেশ থাকলে ফাঁসির মঞ্চে লাঠির সাজাও দেন। বন্দির কি কোনো বিষয়ে রাগ করার অধিকার আছে? যে শাস্তিই দেওয়া হোক না কেন, তাকে নীরবে সহ্য করতে হবে। মৃত্যুদণ্ড দিলেও বন্দিকে রাগ করতে দেওয়া হয় না।

এটাও কর্মসত্তার কোর্টের ব্যবস্থা। শাস্তি ছোট হোক বা বড় হোক... শাস্তিই শাস্তি। তোমার অপরাধের শাস্তি তোমার। তোমাকে শান্তভাবে মেনে নিতে হবে, এটাই তোমার কর্তব্য। কাজেই লোকসান পাঁচ টাকা, পাঁচ লাখ বা পাঁচ কোটি টাকারই হোক, রাগ করার কোনো অধিকার আপনার নেই। তোমাকে থাপ্পড় মারতে হবে, তোমার হাত-পা ভেঙে দিতে হবে অথবা প্রাণ কেড়ে নিতে হবে। কর্মসত্তা দ্বারা আপনার রাগ সহ্য করা হবে না।

সেজন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আদালতের চেয়ে বেশি শাস্তির প্রয়োজন না থাকলে এবং যদি মহাপুরস্কার পাওয়ার ইচ্ছা থাকে, তবে যত দুঃখ-কষ্টের ঘটনাই ঘটুক না কেন, প্রতিবারই ক্ষমা গ্রহণ করতে হবে, রাগ করবেন না। অর্থাৎ, দুঃখের সব ঘটনাই ক্ষমার সুযোগ, রাগ নয়।

একদিনে দশটি যন্ত্র প্রাপ্ত হইলে যতবার ভিতর হইতে ক্রোধ জাগ্রত হয়, ততবার অন্তরে ক্ষমার সঙ্গীত অনুরণিত হয় না।

রাগ স্বাভাবিক মনে হয়। ক্ষমাকে জাগ্রত করতে, একজনকে কঠোর সংগ্রাম করতে হবে। এখন থেকে রাগ করবেন না! এমন দৃঢ় সংকল্প নেওয়ার পরেও

যখনই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তখনই কেউ রেগে যায়। ইচ্ছাশক্তি বাতাসে ওড়ে।

বহুবার ক্রোধের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার পরেও এবং প্রচারেও ক্রোধ ক্ষতিকারক, দায়িত্বজ্ঞানহীন', এমন কথা বারবার বোঝানোর পরেও হৃদয় রাগের পক্ষপাত না করে থাকতে পারে না। আর রাগ না করলে কোনো কাজ করা যায় না, রাগ করলে লোকে কাপুরুষ মনে করে, রাগ না করলে সবার মাথায় ওঠে... ইত্যাদি।

এই এবং এই ধরনের অনেক বিষয় নির্দেশ করে যে অসীম অতীতে অসীম পর্বের আবির্ভাব ঘটেছে। জীব কেবল স্বার্থে রাগ করেছে, কখনও ক্ষমা করেনি, ফলে জীবের অস্তিত্ব ক্রুদ্ধ হয়েছে। এই কারণে, বর্তমান সময়েও, এই ধরনের অনুষ্ঠানে, ভিতরে থেকে কেবল রাগ অনুপ্রাণিত হয়, কিন্তু ক্ষমা করার কোনো অনুপ্রেরণা নেই। এখন, আমরা যদি রাগের তিক্ততা বোঝার পরে আত্মার অস্তিত্বকে ক্ষমা করতে চাই, তবে ক্রোধের ক্ষতি এবং ক্ষমা করার উপকারিতা ব্যাখ্যা করে এবং একই সাথে এই জাতীয় ঘটনাগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত। মননের অতটাই আবশ্যকতা আছে।

একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। কোনো একটা ছুতো পেলেই বয়লারের মত ফেটে পড়তেন। নিজের ক্ষোভে হতাশ হয়ে হিমালয়ের প্রান্তরে চলে গেলেন। সেখানে ত্রিশ বছর বসবাস করেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি কখনও রাগ করেননি, তাই এখন রাগ নিয়ন্ত্রণ করেছেন ভেবে তিনি আবার মানুষের মাঝে ফিরে আসেন। সে সময় যোগ ছিল কুম্ভমেলার দিন ছিল, সর্বত্র প্রচণ্ড ভিড়... তাঁর পায়ের উপর কারও পা পড়ে অকারণে ফুঁসতে থাকেন... তুমি কি অন্ধ? দেখতে পাও না? ত্রিশ বছর রাগ করেননি, তবুও কেন ক্ষমা করতে পারলেন না। আমরা যদি চিন্তা করি, তাহলে বুঝব যে, সেই নির্জনতায় এমন কোনো সুযোগ পাওয়া যায়নি যার দ্বারা ক্ষমা করা অভ্যাস করা যায়।

খুব অল্প বয়সে যেসব শিশুকে চপ্পল-বুট না পরিয়ে কোথাও পাঠানো হয় না তাদের পা খুব নরম হয়ে যায়। ঘোরাঘুরি, কোনো বস্তুর দ্বারা আঘাত করা, পড়ে যাওয়া, রুক্ষ মাটিতে বসে থাকা সবই শিশুর পা - (সন্তানের শরীরও) শক্ত করে।

ছাত্র পর্যায়ে গণনার উপর নির্ভরশীল মনটি ১২৮১৩-এর মতো একটি

সহজ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় দ্বিধাগ্রস্ততা অনুভব করবে — বিভ্রান্ত হবে যখন বৃদ্ধ লোকটি মুহূর্তের মধ্যে এই প্রশ্নের উত্তর দেবে। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে সমস্যা প্রশ্ন, কঠিন প্রশ্ন শুধুমাত্র মন প্রশিক্ষণের জন্য।

দেহ এবং মন সম্পর্কিত একই নিয়ম আত্মার সম্পর্কেও প্রয়োগ করা যেতে পারে, এটি এমনভাবে বলা যেন প্রকৃতি জীবকে বলছে—হায়! আমি আপনাকে গালি দিতে কাউকে পাঠাই যাতে আপনি ক্ষমা করতে শিখতে পারেন। কাউকে অহংকারে অপমান করতে অনুপ্রাণিত করুন। আমি তোমাকে চড় মারার নির্দেশ দিচ্ছি। আপনি মনে করেন যে যদি গালাগালিকারী না থাকে তবে আপনি কীভাবে ক্ষমা করার প্রশিক্ষণ পাবেন? অতএব বুঝুন যে গালাগালি, অপমান, চড় সবই ক্ষমার পাঠ শেখার উপায়, রাগ নয়...

এ ছাড়া মনকে প্রস্তুত করার জন্য শুরুতে ২ + ২ = ৪টি এরকম সহজ হিসাব এবং তারপর আরও একটু কঠিন প্রশ্ন এবং আরও কঠিন প্রশ্ন দিয়ে সেগুলো সমাধান করা হয়।

এভাবে চড়-থাপ্পড়, আঘাতে হাত-পা ভাঙার উপস্থাপিত হয় পরের পাঠ শেখানোর জন্য যে আত্মা হত্যাকারীকে ক্ষমা করার পাঠ শিখেছে। এমন পরিস্থিতিতেও যে আত্মা ক্ষমার সাথে লেগে থাকে না, কেবল তার কারণেই ক্ষমার পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি নশ্বর পরিস্থিতি তৈরি হয়। একইভাবে বুঝতে হবে যথাক্রমে পাঁচ হাজার, পাঁচ লাখ বা পাঁচ কোটি টাকার ক্ষতির কথা। যেন প্রকৃতি বলছে - কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণঘাতী ক্ষত... এসবই ক্ষমার জন্য, রাগ নয়। আর এ কারণেই প্রকৃতি অবশ্যই শাস্তি দেয় যে প্রাণীটি এমন ঘটনায় রেগে যায় এবং যে প্রাণী বিনা সন্দেহে ক্ষমা গ্রহণ করে প্রকৃতি তাকে পুরস্কৃত করে। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা প্রকৃতির কাছে শাস্তি চাই নাকি পুরস্কার চাই? মনের মধ্যে ক্ষমাকে স্থির করার বিষয়ে একটি সত্যও বোঝার মতো যে অন্যের দেওয়া প্রতারণা, অপমান বা আর্থিক ক্ষতি আমাদের রক্তচাপ বা সুগার ইত্যাদিতে প্রভাব ফেলে না, তবে এই জাতীয় বিষয়ে করা রাগ উচ্চ রক্তচাপ রোগকে আমন্ত্রণ জানায়।

একইভাবে, অন্যান্য জীবের দ্বারা সৃষ্ট দুর্দশা আমাদের নরকে নিয়ে যেতে সক্ষম নয়, তবে সেই সময়ে আমাদের দ্বারা করা ক্রোধ অবশ্যই আমাদের নরকে পরিণত করে। পালক পিতা পাঁচশো শিষ্যকে ঘানি খাওয়ালেন, কিন্তু

কেউ রাগ না করায় একজন শিষ্যকেও দুর্দশায় পাঠাতে পারেননি। প্রত্যেক শিষ্যই অতুলনীয় সমতা ধারণ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ক্ষেপে যাওয়ায় দুর্দশার চক্রে ধরা পড়ে।

সর্বজ্ঞ ভগবান মহাবীর প্রসন্নচন্দ্র রাজর্ষি সম্পর্কে মহারাজা শ্রেণিকের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন — তিনি সপ্তম নরকে যাবেন। রাজর্ষিকে সপ্তম নরকে পাঠাচ্ছে? মন্ত্রীদের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে তুমুল মানসিক যুদ্ধ খেলেছে নাকি মন্ত্রীদের দুষ্ট বলে মনে করে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে? দ্বিতীয়বার প্রভু উত্তর দিলেন—

এখন সর্বার্থসিদ্ধ বিমান বা কেবলজ্ঞান অর্জনের এই বৈপরীত্য, এই পরিবর্তনের মূল কারণ কী? মন্ত্রী কি ভালো হয়ে গেছেন? রাজার অনুগত হয়ে গেলেন? না কি মন্ত্রীদের দুষ্ট বলে রেখে তিনি মমতায় এগিয়ে যাবেন? সুতরাং এটা স্পষ্ট যে অন্যদের চরম প্রতিকূল আচরণ আমাদের ততটা ক্ষতি করতে পারে না যতটা আমাদের রাগ করে। এটা একটা সহজ ব্যাপার - গালাগালি শুনতে কি খারাপ ক্ষতি নাকি নরকের বড় ক্ষতি? একইভাবে থাপ্পড় সহ্য করা, হাত-পা ভাঙা-পাঁচ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি সহ্য করা - এটা কি বড় ক্ষতি নাকি নরকে যাওয়া বড় ক্ষতি? আরে! নরকের জীবন স্পর্শ করার চেয়েও বড় ক্ষত আছে। প্রাণহানির সময়েও যদি সাম্য বজায় থাকে, তবে পরম সমৃদ্ধিসহ দীপ্তিময় জীবনের প্রাপ্তি নিশ্চিত, কিন্তু সাম্য হারিয়ে নরকে পৌঁছলে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করে। অসংখ্যবার মৃত্যু। অতএব, একই জিনিস নিশ্চিত যে যে কোনও শ্রেণির বিরূপ আচরণ কেবল হাঁসের ঠকানোর সমান এবং সে সময় ইঁদুরের রাগ বিড়ালের সাহায্য চাওয়ার মতো।

(পৃষ্ঠা ৫৪ থেকে শুরু)

কিন্তু গুণসেনের অনুরোধে, অগ্নিশর্মার ভীষ্ম তপস্যা দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে, যখন অগ্নিশর্মা গুণসেনকে সবচেয়ে পরোপকারী কল্যাণমিত্র হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন, তখন গুণসেন। ব্যাপকভাবে নিরুৎসাহিত হয়েছিল... একে অপরকে জানতে পেরেছিল। গুণসেন অত্যন্ত ভক্তিভরে পারানে আমন্ত্রণ জানালেন, যা অগ্নিশর্মা গ্রহণ করলেন। পারানের দিনে প্রাসাদে

পৌঁছে... কিন্তু গুণসেন, যিনি প্রচণ্ড মাথাব্যথায় আক্রান্ত, পারানের কথা ভুলে গেলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর পারানাকে ছাড়াই ফিরে এল তাপস। তপস্যার পাশাপাশি তিনি নিরপেক্ষভাবেও অগ্রসর হন। গুণসেন উদ্ধারের বন্যা তীব্রভাবে অনুতপ্ত... আশ্রমে আসছে... আবার পারানার যজ্ঞ... অগ্নিশর্মার গৃহীত... কারণ মনে কোনো রাগ নেই। হঠাৎ যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত গুণসেন দ্বিতীয় পারানাও মিস করলেন। পারানার কথা মনে পড়ল... দৌড়ে গেলেন। গুণসেন পথে ফিরে আসার আশা ত্যাগ করেছিলেন... কিন্তু অগ্নিশর্মা তাঁর স্ব-প্রতিশ্রুতিতে কোনো আপস করেননি।

(গবেষণা - পৃ. ৯৬)

৭. ট্যাঙ্কার : পেট্রোলের নাকি জলের

ধূমপানের প্রতি অনুরাগী একজন ব্যক্তি মেয়াদোত্তীর্ণ সিগারেটটি না ফেলেই ফেলে দেন। জ্বলন্ত সিগারেট পড়ে গেল তুলোর কোলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রুইতে আগুন ধরে যায়। পুরো গোডাউন পুড়ে পরিষ্কার, পঞ্চাশ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু তার মালিক ঈশ্বর এই ধূমপান প্রেমিকের কর্মকাণ্ড দেখেছিলেন, তাই তিনি ক্ষতিপূরণ পেতে কোর্ট থানায় মামলা করেন। ধূমপানে আসক্ত আসামির শক্ত ঘরে দাঁড়িয়ে। করতে হবে, তাকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি কি তখন ধূমপান করতে যাচ্ছিলেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ? তিনি উত্তর দিলেন।

সর্বোপরি, আপনি কি একটি সিগারেট নিয়ে ধূমপান করেছেন?

হ্যাঁ হুজুর!

ওই সিগারেটের টুকরোটা তুলোর গোডাউনে পড়েছিল?

হ্যাঁ।

তাহলে গোডাউনের মালিকের পঞ্চাশ লাখ টাকার ক্ষতি পুষিয়ে দিতে হবে, কারণ আপনার সিগারেটেই আগুন লেগেছে।

না, হুজুর না। সিগারেটের টুকরোর কারণে আগুন লেগেছে, এটা ঠিক নয়। এতে বিচারক, উভয়পক্ষের আইনজীবীসহ আদালতে উপস্থিত সবাই হতবাক হয়ে যান।

আজ যদি আপনার সিগারেটের কারণে না হয়, তাহলে কী কারণে?

হুজুর! গোডাউনটি তুলা ভর্তি থাকায় আগুনের সূত্রপাত হয়। মালিক যদি গোডাউনে লোহার স্ক্র্যাপ ভরে রাখত, সিগারেটের কী হত, জ্বলন্ত কাঠ যদি ফেটে যেত, আগুন লেগে যেত?

বাস্তবতা হল যে শুধুমাত্র স্ফুলিঙ্গই আগুন দেয় না, শুধুমাত্র পেট্রোলও দেয় না। দুটির সংমিশ্রণ ঘটলেই অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। একইভাবে, শুধুমাত্র গালাগালির যন্ত্রের কারণেই ক্রোধের আগুন জ্বলে না, একা রাগী প্রকৃতির

আত্মার বস্তুগত রূপের কারণেও ক্রোধের আগুন জ্বলে না। রাগ তখনই দেখা দেয় যখন এই দুইটা একত্রিত হয়। সে আমাকে গালি দিল রাগ করলাম কেন? এমন কথাকে সম্পূর্ণ সত্য বলে মেনে নেওয়া ভুল। আর যে বর্তমানের অশান্তি চায় না এবং ভবিষ্যতে দুঃখ-দুর্দশা চায় না, তার জন্য এটা সম্পূর্ণ অন্যায়।

আবার জিজ্ঞেস করলেও যে যুবক অঙ্গার চাইতে এসেছিল তাকে জিজ্ঞাসা করলেও সন্ন্যাসী বললেন, ভাই, শুনছেন না? আমরা একবার তো বলেছি আগুন নিভে গেছে। এ কথা বলার পরও ফের দাবি করেন ওই যুবক। এবার সন্ন্যাসীর খারাপ লাগল। বলল, জেদ করেছিস কেন? তাই যুবকটি বলল, স্বামীজী, অসত্য কথা বলছেন কেন? ছাইয়ের নিচে চাপা আগুন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

তোমাকে বড় মনে হচ্ছে। পরিষ্কার বলা আছে আগুন নেই, তবু জিজ্ঞেস করতে থাকে। কথায় তার রাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আমি নিজ চোখে ধোঁয়া দেখছি, স্বামীজী! আর আপনি না বলছেন কেন? যুবকের মুখ থেকে এই কথা শুনে সন্ন্যাসী চিমটা তুলে যুবকের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যুবকটি একই মেজাজ নিয়ে বলল, এখন তোর আগুন থেকে স্ফুলিঙ্গ বেরোতে শুরু করেছে। আগুন না লাগলে এটা কীভাবে সম্ভব হবে?

ভিতরে আগুন আছে, এর মানে হল উপাদান আছে। এবং যদি উপাদান থাকে তবে একটি ছোট স্পার্কও বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। আপনার সাথে উপাদান রাখার জন্য এবং তবুও এটি বিস্ফোরিত হয় না, এটির জন্য কোনো স্ফুলিঙ্গ নেই, শুধুমাত্র পাখা দ্বারা নয়।

আশা করা... সেটা কখনই সফল হবে না, কারণ এতে কোনো স্বাধীনতা নেই। আমাদের সংস্পর্শে অনেকেই আসে, তাদের মধ্যে কে, কখন, কোথা থেকে, কীভাবে স্ফুলিঙ্গ ফেলবে, কি বলা যায়? সবার হাত চিরকাল বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। এবং আমাদের উদাসীনতা, পশ্চাদপসরণ, আমাদের নিজস্ব অতীত ক্রিয়াকলাপ—এগুলি অন্যান্য লোকেদেরও স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করতে উসকে দিতে পারে। সেজন্য কোন স্ফুলিঙ্গ হবে না এমন আশা করা বোকামি. যদি বিস্ফোরণের অনুমতি না দেওয়া হয়, তবে উপাদানটি নিজেই সরিয়ে ফেলতে হবে, অর্থাৎ আপনার আত্মাকে এমনভাবে প্রস্তুত করুন যাতে কেউ

গালি দিলে বা কিছু করলে ক্রোধের আগুন না ওঠে। আরে! ক্রোধের আগুন কি, বরঞ্চ হৃদয়ে শুধু প্রেম ও মমতার স্রোত বয়ে যেতে হবে শত্রুর দিকে। গোরখপুর থেকে প্রকাশিত হিন্দি মাসিক কল্যাণের ৩৫ সালের একটি সংখ্যায়, আমি এই প্রসঙ্গে ৯৫২ থেকে ৯৫৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি সত্য ঘটনা উল্লেখ করছি।

এটি প্রায় চল্লিশ বছর আগে ঘটেছিল। রামতনু, হুগলি জেলার একটি ছোট গ্রামের পুরোহিতের ছেলে কলকাতায় যান। চাকরির পাশাপাশি পড়াশোনা করে M.A. করেছেন। ধীরে ধীরে মাসে দুইশত টাকা বেতনে সরকারি স্কুলের শিক্ষক হন। সেই দিনগুলিতে, এই জাতীয় বেতন খুব বেশি হিসাবে বিবেচিত হত। তার এবং তার স্ত্রীরও খুব ভালো স্বভাব ছিল। অহংকার এক ভগ্নাংশও নয়। কারও খারাপ কখনওই চিন্তা করে না। বরং সবার ভালো করার চেতনা ও প্রচেষ্টা ছিল। তাই গোটা গ্রামেই তিনি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও প্রশংসার পাত্র হয়ে রইলেন। কিন্তু তাঁর এক প্রতিবেশী অধরচন্দ্র তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি দেখে খুব ঈর্ষান্বিত হয়ে রামতনুকে নিরস্ত করার জন্য বারবার কিছু না কিছু করতেন। কিন্তু দৃষ্টি যেমন, সৃষ্টিও তেমনি। রামতনবাবুর চোখে শুধু বন্ধুত্ব আর মমতার স্রোত বয়ে চলেছে, তাই তিনি সবাইকে বন্ধু মনে করতেন। অর্ধচন্দ্র যে বৈরী আচরণ করতে পারে তা কল্পনাও করেননি।

একদিন অধরচন্দ্র একটি কুটিল পরিকল্পনা করল। সে দু-তিনটি গুন্ডাকে ঠিক করল। বাইরে থেকে একটা কুলটা মহিলাকে ডাকা হলো। এই মহিলা চিৎকার-চেঁচামেচি করে রামতনুবাবুর বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করবে এবং তারপর তাকে বাঁচানোর অজুহাতে গুন্ডারা তাকে এভাবে আঘাত করবে। একদিন সে তার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করল।

বিকেলে রামতনুবাবু বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। ভদ্রমহিলা একটা নির্জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। রামতনুবাবু ওখান দিয়ে যেতেই চিৎকার করতে লাগলেন-হারামখোর, ছাড়ো... ছাড়ো আমায়...! একজন ব্রাহ্মণ শিক্ষক হয়ে এমন গুন্ডামি করছ? আমার কি কোনো সম্মান নেই? কেউ বাঁচাও... কেউ আমাকে বাঁচাও...? এভাবে কথা বলতে বলতে সে সঙ্গে সঙ্গে তার খুব কাছে চলে আসে। তার জামাকাপড়ও এলোমেলো করে দেয়। অধরচন্দ্র কাছেই গুন্ডাদের নিয়ে লুকিয়ে ছিল। সেও বাইরে এসে চিৎকার করতে থাকে। গালিগালাজ করে রামতনুবাবুকে মারতে শুরু করে। গুন্ডারাও তাকে আক্রমণ

করে, রামতনুবাবু প্রচণ্ড আঘাতে স্তব্ধ হয়ে যান। তিনি বুঝতে পারছিলেন না কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে? শোরগোল শুনে আশপাশের বাড়ির লোকজন দৌড়ে বাইরে এসে ভিড় জমায়।

রামতনুবাবুর ভদ্রতার সঙ্গে লোকে পরিচিত ছিল। তাঁর প্রতি সবার শ্রদ্ধা ছিল। কারণ, প্রায় সব মানুষেরই তিনি কোনো না কোনো সময়ে কোনো না কোনো উপকার করেছেন। যাই হোক, অর্ধচন্দ্রের উপরও একটি অনুগ্রহ করা হয়েছিল। প্রতিবেশী হওয়ায় তাকে অনেকবার সাহায্য করেছেন। উল্লাস যখন গ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অধরচন্দ্রও তাতে ভুগেছিলেন এবং তখন তাঁর পরিবারের লোকেরা-সবাই তাঁকে একা ফেলে রেখেছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন স্বার্থপর। সেই সময় রামতনুবাবু তাঁর সেবা, পরোপকারের চেতনা দেখিয়ে দিনরাত তাঁর সেবা করেছিলেন। নানা ধরনের প্রতিকার ও ওষুধের সাহায্যে তিনি রক্ষা পান। সুস্থ হওয়ার পরই তার পরিবারের সদস্যরা ফিরে আসেন। আর সেই অকৃতজ্ঞ অধরচন্দ্র আজ ঈর্ষায় রামতনুবাবুকে অপদস্থ করতে চাইছিলেন।

কিন্তু প্রকৃতি তার নিজের কাজ করে। এই সমস্ত দৃশ্য দেখার পরেও, লোকেরা রামতনুবাবুর নির্দোষতা এবং ভদ্রতায় বিশ্বাস করেছিল এবং এই সমস্ত জানত — অধরচন্দ্র অপরাধী এবং দুষ্ট। কেউ কেউ সেই মহিলাকে চিনতেও পেরেছিল যে সে পাশের গ্রামের একজন ভবঘুরে নিচু মহিলা এবং এই ধরনের কাজের জন্য সে কুখ্যাত ছিল। মানুষও গুন্ডাদের চিনতে পেরেছে। রামতনুকে বাঁচানোর পর তারা সবাই অধরচন্দ্র ও গুন্ডার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কিন্তু নরম মনের রামতনুবাবু এই সব সহ্য করতে না পেরে হাতজোড় করে মানুষের কাছে অনুরোধ করলেন। নিজে মাঝখানে এসে অনেক কষ্টে সবাইকে বাঁচাতেন। বিপথগামী মহিলাটি সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তবু এসব দেখে দুজন লোক ছুটে গেল দূরের গ্রামে খবর দিতে, সেখানে একটা পুলিশ চৌকি। পুরো বিষয়টি শোনার পর পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ফৌজদার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে অধরচন্দ্র ও গুন্ডাদের ধরে ফেলেন। সমস্ত লোক সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত ছিল, সেই মহিলাকেও পুলিশে পাঠিয়ে ডাকা হয়েছিল। তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গে তার অপরাধ স্বীকার করে বললেন যে অধরচন্দ্র তাকে পনেরো টাকা দিয়ে সেই কাজটি করিয়েছে। কিন্তু রামতনুবাবুকে যে সব গুন্ডা মেরে ফেলবে তা তার ধারণা ছিল না।

অধরচন্দ্রের অবস্থা তখন সহজেই অনুমেয়। তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। তার অবস্থা দেখে রামতনুবাবুও খুব দুঃখ পেলেন। অধরচন্দ্রকে ছেড়ে দিতে ফৌজদারের কাছে অনুরোধ করলেন। পুলিশ কর্মকর্তা তাঁর সম্মান রক্ষার্থে তাকে সম্মান দেখালেও কড়া ভাষায় বলেন—আপনি আমাদের কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। তাদের সবাইকে আমরা হাতেনাতে ধরেছি। তাদের শাস্তি দেওয়ার মতো যথেষ্ট সাক্ষী ও প্রমাণ আমাদের কাছে আছে, তাই এ বিষয়ে কিছু বলব না। রামতনুবাবু অনেক অনুনয়-বিনয় করায় বললেন, হুগলি থেকে আপনার থাপ্পড় ও মারধরের রিপোর্ট তৈরি করতে আমরা ডাক্তার ডেকেছি এবং আপনি এদের মুক্ত করতে চান? ফৌজদার সসম্মানে রামতনুবাবুকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে একজন পুলিশ কর্মীকেও পাঠানো হয়েছিল, যিনি আটকে গেলে রিপোর্ট নিয়ে থানায় আসেন।

এ দিকে গ্রামের বহু মানুষ রামতনুবাবুর বাড়িতে ভিড় জমায়। অপরাধীদের শাস্তি পেতেই হবে! সবাই এটাই চেয়েছিল। কিন্তু রামতনুবাবুর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন।

অধরচন্দ্রকে বাঁচানোর প্রবল ইচ্ছা ছিল তাঁর। তিনি জনগণের উদ্দেশে বলেন, প্রতিটি মানুষ তার স্বভাব অনুযায়ী কাজ করলেও সবাইকে কষ্ট পেতে হয়। আমি যে আঘাত পেয়েছি তা আমার নিজের অতীত কর্মের ফল। যদি আমার কোনো অপকর্ম না থাকত, তবে অর্ধচন্দ্রের কী এমন শক্তি যে আমার চুলও ছুঁতে পারে? অর্থাৎ আমি আমার কর্মফল পেয়েছি। অর্ধচন্দ্র একটি নিমিত্ত মাত্র। কিন্তু এ কারণে সে ও তার পরিবার বিশৃঙ্খলায় আটকে আছে! এজন্য তারা করুণা ও ক্ষমার যোগ্য। তাই আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করছি যে, আমরা সবাই ফৌজদারের কাছে দোয়া করি যেন তিনি এ ব্যাপারে এগিয়ে না যান। আর যদি তারা আমাদের এই অনুরোধ গ্রহণ না করে, তবে আমাদের এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাতে কেউ অধরচন্দ্রের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেয়। আমি এখনও আমার জবানবন্দি জমা দিইনি। আমি বলব যে পড়ে যাওয়ার কারণে আমার চোট লেগেছে।

এ সব শুনে মানুষ হতবাক। কেউ মনে মনে রামতনুবাবুর প্রশংসা করছিল আবার কেউ কেউ তাঁর প্রশংসা করছিল যে এভাবে অপরাধকে উৎসাহিত করা হবে। কিন্তু রামতনুবাবুর চোখ থেকে করুণার অশ্রু ঝরছিল। গ্রামের মানুষের মধ্যে শ্রী হরিপদ নামে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি রামতনুবাবুর প্রশংসা

করলেন এবং গ্রামের লোকদের কাছে তাঁর বক্তব্য বোঝানোর চেষ্টা করলেন। এখন গ্রামের মানুষের মনও কিছুটা বদলেছে। কিছুক্ষণ পর ডাক্তারও এলেন। রামতনবাবুর ভদ্রতার সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন। ডাক্তার তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। রামতনুবাবু তাঁকে অধরচন্দ্রের পক্ষে এমন রিপোর্ট দিতে রাজি করান। কিন্তু এই জিনিসটা তাঁর মাথায় ঢুকল না, তবু তিনি এটাই মেনে নিলেন যে, এখন আর কোনো রিপোর্ট লিখব না। ফৌজদার আপনার কথা মেনে নিলে রিপোর্ট লেখার দরকার হবে না।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর তিনি গ্রামের চার-পাঁচজন বৃদ্ধকে নিয়ে থানায় যান, ফৌজদারকে সব বুঝিয়ে বলেন এবং মামলা না করে সবাইকে রেহাই দেওয়ার জন্য অনেক অনুরোধ করেন। থানাদারের উপরও রামতনুবাবুর করুণার একটা সুন্দর প্রভাব পড়েছিল। রামতনুবাবুর ওপরও প্রভাব পড়েছিল।

অধরচন্দ্র ও তার সঙ্গীরা এই সব কথা শুনলে তাদের বিবেকের মধ্যে অনুশোচনা জাগে। তাদের বিবেক অনুতাপের আগুনে শুদ্ধ হয়ে উঠছিল. এ সময় প্রমথবাবু ওই ভদ্রলোকদের উদ্দেশে বলেন, যে সব অপরাধীকে হাতেনাতে বাঁচিয়ে আপনারা অপরাধ বৃদ্ধির হাতিয়ার হয়ে উঠলেন। এ ধরনের অপরাধীদের একটুও শাস্তি না হলে তারা আরও অপরাধ করবে যা সমাজের জন্য ভয়ংকর। রামতনুবাবুর হৃদয়ে করুণ বয়ে চলেছে। তারা হয়তো এটা বুঝতে পারে না। কিন্তু আপনারা সবাই তার সঙ্গে এমন একটা বিষয়ে যোগ দিচ্ছেন কেন?

এখন শ্রীহরিপাদ এবং রামতনুবাবু প্রমথবাবুকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে অপরাধ শুধুমাত্র ভালোবাসা এবং সহানুভূতি দিয়ে কমানো যায়, শাস্তি দিয়ে নয়। দুঃখের সময়ে নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমেই অপরাধীর মন পরিবর্তন করা সম্ভব। এবং আমরা সবাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে অধরচন্দ্র ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে যদি সাক্ষী না দেওয়া হয়, তবে আপনি কী করতে পারবেন? প্রমথবাবুর উপর এই সমস্ত কিছুর বিশেষ প্রভাব পড়েছিল, যিনি ইতিমধ্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তবুও তিনি একটু কড়াভাবে বললেন, তোমাদের সবার প্রতি আমার অনেক শ্রদ্ধা আছে। আমি ওঁর ক্ষমা এবং উদারতার প্রশংসা করি, তবে অপরাধীকে এভাবে রেখে আমরা আমাদের দায়িত্ব উপেক্ষা করতে পারি না। এক্ষেত্রে কী করা যায় তা ভাবতে হবে। আপনি যদি এখন তাদের থেকে পরিত্রাণ পেতে চান, তবে আপনার একজনকে তাদের জামিনদার করতে হবে।

প্রমথবাবুর কথা শেষ হওয়ার আগেই রামতনুবাবু বললেন, মহাশয়! আপনি যাই বলুন না কেন, আমি যে কোনো রূপে মুচলেকা দিতে প্রস্তুত। তাঁর এই কথা শুনে এসএইচও এবং ইন্সপেক্টর উভয়েরই মন কেঁপে উঠল। তারাও মানুষ ছিল। অধরচন্দ্রকে বললেন, 'এসব শুনছেন, তাই না? এখন কী বলার আছে?'

অধরচন্দ্রের চোখ থেকে অশ্রুর ধারা বয়ে গেল। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, হুজুর! আমি শয়তান এবং উনি দেবতাদের একজন শ্রদ্ধেয় সাধু। তবুও ছুঁতে চাই না। আমাকে আজীবন কালাপানির শাস্তি দিলে সেটাও কম, আমার অপরাধ খুবই ভয়ানক। আপনি কোর্টে মামলা করুন। আমি নিজেই আমার অপরাধ স্বীকার করব।

প্রমথবাবুর ডাকে থানেদার সবাইকে ছেড়ে দেন। মামলার সব কাগজপত্র ছিঁড়ে গেছে সবাই খুশি মনে সেখান থেকে চলে গেল। প্রমথবাবু ও থানাদার দুজনেই রামতনুবাবুর পা স্পর্শ করলেন।

একেই বলে - রাগের কারণকেই দূর করতে হবে। তিনি আত্মাকে জলের সাপোর্ট দিয়েছিলেন। এখন, ''এতে দেওয়ার মতো কেউ নেই''। পেট্রোল গ্রহণকারী সর্বদা স্ফুলিঙ্গের ভয় পায়। জল গ্রহণকারীর ভয় কীসের? তারও স্ফুলিঙ্গ নেভানো উচিত। চণ্ডকৌশিক প্রভুর দিকে শুধু স্ফুলিঙ্গই নিক্ষেপ করেননি, আগুনের প্রবল শিখা মাত্র। তবু কোনো বিস্ফোরণ বা অগ্নিশিখা ছিল না, এবং চণ্ড কৌশিক নিজেও এতটাই ঠান্ডা ছিলেন যে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন।

পেট্রোল ট্যাংকারকে ওয়াটার ট্যাংকারে রূপান্তর করতে হবে। পেট্রোল নেই-জ্বালানি নেই, তাহলে আগুন লাগার সম্ভাবনা কোথায়? প্রাণী হাতিটি তার অতীত অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পেরেছিল যখন এটি একটি হাতি ছিল। ভয়ংকর জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ে জঙ্গলে পোড়ানো পশুপাখি গ্রাস করতে বাধ্য হয়। পুরো ছবিটা চোখের সামনে দাঁড়াল। এখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে এই জীবনে যাদের কষ্ট করতে হবে তাদের জন্য একটি নিরাপদ জায়গা তৈরি করবেন। ভয়াবহ বনের আগুনের শিখা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেও তার কোনো প্রভাব নেই, কোনো শিখা সেখানে পৌঁছয় না... এটা তখনই সম্ভব যখন কাঙ্ক্ষিত স্থান থেকে জ্বালানি সরানো হয়। একটি বনাঞ্চলের সবচেয়ে বড় জ্বালানি গাছ। তিনি সমস্ত গাছকে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলে যোজন

দূরে ফেলে দেন। একটি বিশাল মাঠ তৈরি করেন। এবং এমনকী, পরে, যদি একাদাটিঙ্কা দেখা দেয় তবে তিনি এটিও পরিষ্কার করতেন। এক সময় বন উজাড় হলে হাজার হাজার প্রাণীর সুন্দর সুরক্ষা করা যেত এই মাটিতে।

প্রশ্ন। কিন্তু সাধারণ ক্যাসকার পানির ট্যাঙ্কে পেট্রোলের কি রূপান্তর সম্ভব?

উত্তর। সম্ভব। গানের আওয়াজ আর কিছুক্ষণের জন্য কানে ঢুকে গেল, নিদ্রাহীনতা ও ক্রোধের পারদ এমনভাবে চড়ল যে তিনি বিছানার রক্ষকের কানে গরম সীসার তরল ঢেলে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। দুর্বাসার মতো রাগী প্রকৃতির আত্মা এতটাই ক্ষমা শুষে নিল যে কানে তীক্ষ্ণ আঘাতের পরও ক্রোধের একটি রেখাও ফুটে উঠল না।

ঋষির গৃহে সাধারণ দাহ্য জ্বালানির মতই তা করা হয়েছিল রাগ বালামুনির উপর। চণ্ড কৌশিক ঋষির বাড়িতে দাহ্যতা বেড়েছে। ‘‘যারা আশ্রম থেকে ফল ছিনিয়ে নেয় তাদের শেষ করে দিই।” আর বিষধর সাপের উপস্থিতিতে প্রকৃতি হয়ে ওঠে ভীষণ দাহ্য। ‘‘আমাকে আমার সামনে আসা দৃশ্যটি শেষ করতে দাও।” কিন্তু পরবর্তীতে ভগবান বীরের করুণার স্রোতে এমনভাবে যে বীণার দাহ্যতা নিভে গেল! বরফের মতো শীতল হয়ে উঠেছে প্রকৃতি! মানুষ পাথর ছুড়েছে, করজাঙ্গলের পিঁপড়েরা আগুনে ফেটে গেছে, এইভাবে তাদের শরীরে দংশন করেছে এবং কিছু ল্যানিসা তৈরি করেছে, কিন্তু রাগের চিহ্নও নেই। একটি বিষধর সাপও যদি রাগকে এতটাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, ক্রোধের জ্বলন্ত পেট্রোলকে ক্ষমার জলে পরিণত করতে পারে, তাহলে আমরা কেন পারব না?

কীভাবে এই কাজটি করা যায়, আমরা পরের পর্বে দেখব...

(পৃষ্ঠা ৮৮ থেকে শুরু)

অগ্নিশর্মা তাকেও তৃতীয় পারানের সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাকে আশ্বস্ত করার জন্য যে তৃতীয় পারান চলছে... সেখানে একটি অতুলনীয় সমতা ছিল। অগ্নিশর্মা তৃতীয়বারের মতো রাজপ্রাসাদে এসেছেন পারানে। কিন্তু রানি আজ পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। খুশিতে উচ্ছ্বসিত পুরো রাজপরিবার। তপস্বীদের কাছে আসুন... আমন্ত্রণ পাওয়ার

জন্য বিনামূল্যে কেউ নেই। কিছুক্ষণ পর, অগ্নিশর্মা ফিরে আসেন... কিন্তু তিনি তার আদর্শ পরিবর্তন করেন। গুণসেনের নিষ্ঠুর উপহাস... এখন তিন-তিনবার পারানা পরিশোধ করছি... কোন না কোনো অজুহাত দেখিয়ে গুণসেন এখনও আমাকে উপহাস করছে। ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে এই দীর্ঘ ও কঠোর তপস্যার কারণেই আমার উচিত হবে। ভবভাব গুণসেনাকে হত্যাকারী হয়ে উঠুন... কুলপতি ইত্যাদি নানাভাবে সবাইকে বুঝিয়েছেন... কিন্তু তিনি শত্রুতার গাঁট শিথিল করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

(গবেষণা - পৃ. ১২১)

৮. পেট্রোল – জল

একটি বাড়িতে আগুন লেগেছে। জ্বলন্ত শিখা আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করছিল। ওই বাড়িতে থাকতেন দুই ভাই। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয়। বড় ভাই ছোট ভাইকে পরাস্ত করার চেষ্টা করছিল। বললেন, তুমি এতই পুড়ছ যে, এই আগুন কেন শুরু হয়েছে। ভোট ভাইও পিছপা হননি। 'আমি কী করেছিলাম? দোষটা তোমার।' দুজনেই আলোচনায় হারিয়ে যায় এবং প্রতিবেশীরা চিৎকার করে - 'আরে! আগে আগুন নেভানোর জন্য কিছু করো।' কিন্তু ভাইরা কেউই রাজি হচ্ছেন না... কার দোষ আগে ঠিক করা যাক... পরে আগুন লাগবে। নিভে যাবে...?

এই দুইজনকে কী নামে ডাকবেন? বুদ্ধিমান নাকি পাগল?

সভা - এতে প্রশ্ন কোথায়? দুজনেই পাগল। কারণ কার ভুল সিদ্ধান্ত, ততক্ষণ পর্যন্ত সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তাহলে দোষটা কার ছিল, সেটা ঠিক হয়ে গেলেও লাভ কী?

তাহলে এই জিনিসটি ইঙ্গিত করে যে আগুন লাগলে প্রথম দায়িত্ব আগুন নেভানো, কার দোষ নয়? নিশ্চিত করা...

জ্ঞানীরা বলেন—ঘরে যেমন আগুন লাগে, তেমনি আত্মার দালানে আগুন জ্বলে-ক্রোধের আগুন। এই আগুন যখন প্রজ্বলিত হয়, তখনও মানুষের প্রথম কর্তব্য সেই আগুন নিভিয়ে দেওয়া। এমন নয় যে তুমি আমাকে বানোয়াট করেছ, তাই আমি রাগ করেছি ইত্যাদি, কার ভুল তা ঠিক করতে...

জল ছিটিয়ে আগুন নেভানো হয়। পেট্রোল ঢাললে আগুন আরও বেড়ে যাবে। ক্রোধের আগুনের ক্ষেত্রেও তাই। কোনটি জল ছিটালে ক্রোধের আগুন নিভে যায়?

কোন পেট্রোল সবচেয়ে বেশি ক্রোধ জ্বালায়? সংক্ষেপে, রাগের জন্য জল কী এবং পেট্রোল কী?

নিজের পোড়া দেখে এই রাগের আগুনের জল, আর অন্যের ভুল দেখলে এই রাগের ইন্ধন।

সেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বৈঠক হয়। আপনাকেও তাতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আপনি একেবারে নতুন, চকচকে, উজ্জ্বল সাদা কিছু পরতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একটু দেরি হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি রেডি হতে হবে। তুমি নৌকা নিয়ে বললে, এসো এই রুমাল, সব রংয়ের পকেটে পাকিত-কলমের ছাই রাখুন। জামাকাপড় পরে বাইরে যাওয়ার আগে পকেটের কাছে একটি বড় নীল কালির দাগ দেখা গেল। চাকর কলম রাখতে গিয়ে ঢাকনাটা ঠিকমতো বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। দাগ দেখে তোমার রাগ সপ্তম আকাশে পৌঁছেছে। প্রদীপ চাকরের গালে একটা জোরে চড়।

হারামজাদা! কলম এবং কাঠ ঠিকভাবে বন্ধ করতে জানো না?

কয়েকদিন পর একই ধরনের ঘটনায় আপনি নিজেই কলমটি পকেটে রেখে ঢাকতে ভুলে গেলেন। তাহলে নীল দাগ ফুটতে কতক্ষণ লাগবে? এই দাগ দেখলেই আপনার রাগ সপ্তম আকাশে চলে যাবে পৌঁছাতে? নিজের গালে শক্ত করে একটা থাপ্পড় দেবেন, তাই না? না, কেন? কারণ এমন রাগ কখনও পাবেন না। কারণ আজ আমি নিজেই নেতিবাচকতা দেখেছি।

আপনি এক মাসের জন্য ভ্রমণে গেছেন। অংশীদার একটি চুক্তি করে এবং এক লাখ টাকার ক্ষতি হয়। আপনি জেনে এসে বলবেন—এরকম ব্যবসা কী? এমনকী আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না? আমি যখন বাইরে ছিলাম তখন কী হয়েছিল? পথ দেখা উচিত। আজ এক লাখের ক্ষতি হয়েছে, কাল পাঁচ লাখ হবে। এভাবে দেউলিয়াত্ব বেরিয়ে আসবে।' কী বিরক্তি বোধ করবেন? মন খারাপ হবে না? এবং উল্টোটা... অংশীদার হবেন না এবং আপনি চুক্তি করেছেন। এতে এক লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। সেই সঙ্গী বিরক্ত হলে কী বলবেন?

এত হট্টগোল কেন? ব্যবসা আছে, তাতে কখনও লোকসানও আছে। এই বিষয়ে ঝগড়া না করে, আপনি যদি অন্য চুক্তিতে মনোযোগ দেন তবে আপনি কি ক্ষতিপূরণ করতে সক্ষম হবেন? অন্যের ভুল দেখে আমাদের আচার-আচরণ ও কথাবার্তা কেমন হয় এবং নিজের ভুল দেখে আমাদের কথাবার্তা কেমন হয় আমাদের আচরণের স্বভাব?

এক ছুটির দিনে বাড়ির উঠানে চেয়ারে বসে বাবা-ছেলে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ রান্নাঘর থেকে কাচের বয়াম পড়ার শব্দ এল।

বাবা ছেলেকে বললেন, ভিতরে গিয়ে দেখ, কার হাত থেকে কলসি ভাঙছে?

ছেলে ভিতরে না গিয়ে বলল... মায়ের হাত থেকে...

পিতা পুত্র! না দেখে বললি কীভাবে?

"বাবা, বয়ামটি বিভক্ত হওয়ার পরে আর কোনো শব্দ ছিল না, তাই আমি বলছি।"

জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে এমন অনেক ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মানুষ যখন নিজের পুড়তে দেখে তখন রাগের আগুন জ্বলতে শুরু করে না, কিন্তু সে সময় যদি সে অন্যের দোষ দেখতে শুরু করে, তবে সে পালাতে পারে না। ক্ষোভের আগুন থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।

এই সমস্ত কিছুর মধ্যে, অগ্নিশর্মা আমাদের জন্য একমাত্র লিটমাস পেপার। প্রথম উত্তরণ ঘটেনি। অগ্নিশর্মা তপোবনে ফিরে আসেন। তাপস জানতে পারলেন পারান ঘটেনি। সবার মন খারাপ হয়ে গেল। গুণসেনের বিরুদ্ধে অনেক সাহাবীর মনে ক্ষোভও ছিল। কিন্তু অগ্নিশর্মা তাদের সবাইকে বললেন—অরোগ্যং সে হভু গুরুয়ানপুয়গস, সেই মম অহরেনন্তি? (গুরুর আরাধনাকারী গুণসেন, সুস্থ থাকুন। কেন আমার খাদ্য সম্পর্কে চিন্তা? অর্থাৎ, ঘটল বা না হলো, তাতে আমার কী পার্থক্য আছে?) এখন গুণসেন আশ্রমে পৌঁছেছে। কুলপতির সাথে পারানা পরিশোধের কথা বলতে গিয়ে খুব ভয় পেয়েছিলাম। এরপর উপাচার্য গুণসেনকে বললেন—বৎস স্বভস জননীভুও খু হোই ত্বাসিন্নো। কেন আপনি পাড়া পেতে? (বৎস! তপস্বী সকলের মায়ের মত। তাহলে তার সাথে কথা বলতে লজ্জা কীসের, অর্থাৎ মা?) দ্বিতীয়বার, পারানের দিনে, অগ্নিশর্মা গুণসেনার প্রাসাদে পৌঁছন, তাঁকে স্বাগত জানানো হয়নি বা তাঁর প্রতি কোনো মনোযোগও দেওয়া হয়নি। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর তিনি ফিরে আসতে শুরু করলেন। সেই সঙ্গে গুণসেনা মনে পড়ল পরণে। ভয় পেয়ে আশ্রমের দিকে ছুটলেন। পথেই পাওয়া গেল অগ্নিশর্মাকে। তিনি তাকে ফিরে আসতে এবং তাকে পারানের সুবিধা দিতে অনুরোধ করেন। এমন সময় অগ্নিশর্মা বললেন, শচপাইন্না খু ত্বাসিনো হাবন্তি, নিবিষেষ ইয়া

লাভলাভেসু? অর্থাৎ, সন্ন্যাসীরা সত্যবাদী - তারাই তারা যারা প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করে - আক্ষরিক অর্থে, তারা সামান্যতম আপস করে না। তাই আমিও পারানের কারণ থেকে ফিরে আসতে পারি না এবং পারান থাকুক বা না থাকুক, উভয় পরিস্থিতিতেই সন্ন্যাসীরা সমান মনের অধিকারী। (অর্থাৎ, পারানা না ঘটলেও, তাতে আমার কোনো পার্থক্য নেই। আমিও সমান সুস্থ-সানন্দ।) কিন্তু তৃতীয় পারানটিও যখন ভুলে যায়, তখন শ্রী হরিভদ্রসুরি মহারাজের গ্রন্থগুলি দেখুন - আলথান্ত্রম্মি ইয়া অলনাদোসেনাম বিভিয়াপরমথমগত্নে ইয়া গহিও কাসায়েহিম, অবগায়া থেকে পরলোয়াবাসন, পানাত থা ধম্মসদ্ধ, সমগায় শ্যালদুখ্যাৎকার্য্য অগ্নিগ্রুগ্যোর অর্থ, দুষ্টুখ্যাৎকার্য্য অগ্নিসংযোগ করা যায় না। এর অনুভূতি আত্মসাৎ করা পরকালের উন্নতির তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল, ধর্মের প্রতি বিশ্বাস বিনষ্ট হয়েছিল, সমস্ত দুঃখের বৃক্ষের আকারে শত্রুতা অর্থাৎ শত্রুতার জন্ম হয়েছিল... এবং শরীরে জর্জরিত তীব্র ক্রোধের উদ্ভব হয়েছিল।

উপাচার্য প্রদত্ত কর্ম বিজ্ঞান ভুলে গিয়েছিলেন, যার কারণে তিনি অজ্ঞ হয়েছিলেন। এবং ''তিনবার পারান নেই এবং সেজন্য ক্ষুধা প্রভৃতি যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়, এর মূলে রয়েছে কর্মসত্তা,'' গুণসেন।

না, তিনি একজন জেলর মাত্র। এমন আদর্শ দানশীল। এই ধরনের মতাদর্শের প্রভাবে সমতা বজায় রাখাই হল আত্মকল্যাণের চূড়ান্ত পথ এবং একটি উজ্জ্বল বিশ্বের। এই পথের প্রাপ্তির উচ্চ বোধ ক্ষীণ হয়ে গেছে, যার ফলশ্রুতিতে গুণসেনকে দোষারোপ করা হয়, এই বিশ্বাস দৃঢ় হতে থাকে। অন্যের দোষ দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গেই ক্রোধের শিখা প্রজ্বলিত হয়, রাগ হলে জাগতিক সৃষ্টি এবং ধর্মের প্রতি বিশ্বাস অদৃশ্য হয়ে যায় এবং সমস্ত দুঃখের মূল, শত্রু মনের নিয়ন্ত্রণ নেয়। লিটমাস্টে স্ট্যাক রিপোর্টে স্পষ্ট। দুবার পারান লাভ করা সম্ভব হয়নি ততদিনে আত্মান্ধের সৃষ্টি ছিল। ততক্ষণ পর্যন্ত মনটা এমনই সুস্থ, সুখী ও পবিত্র ছিল। কিন্তু তৃতীয়বার পারানা ভুলে গেলেন, এখন গুনসেনের ভুলটা দেখা গেল। অন্যের ভুলের দৃষ্টি... এই পেট্রোল... রাগের আগুন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। তাতে আজ মনের শান্তি, স্বাস্থ্য, সুখ, সৌন্দর্য সবকিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। আর এখন... অশান্তি, নিষ্ঠুরতা, শত্রুতার দূষণ মনকে কলুষিত করেছে।

মহাসতী সীতার জীবনে লব-কুশের গুণী প্রাণীর বিকাশ ঘটছে। তার প্রভাবে আমি অমরিপ্রবর্তন করি, ভগবান ভক্তির উৎসব করি, পুণ্য দান করি, তীর্থযাত্রা করি। তীর্থযাত্রা ছাড়াও অন্য সব দোহাদ রামচন্দ্রজী সম্পন্ন করেছিলেন। এরই মধ্যে লোকেরা সীতাজীকে কলঙ্কিত করল - দীর্ঘকাল ধরে রাবণের গৃহে বসবাসকারী সীতাজীকে আমরা কীভাবে নির্দোষ লঙ্কা মনে করব? তাদের সতীত্ব কীভাবে পবিত্র হবে? এমন কথা ছড়াতে আর কত দেরি? বিষয়টি রামচন্দ্রজীর কাছে পৌঁছয়। তিনি সীতাজীকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন কমান্ডার কৃতন্তবদনকে।

রথ প্রস্তুত করে সেনাপতি সীতাজীর কাছে এলেন। ''দেবী! আপনার কি তীর্থযাত্রার ইচ্ছা আছে? এসো, রথ প্রস্তুত।''

সীতাজীর মনে কোনো সন্দেহ নেই। সে রেগে গেল। সেনাপতি রথ নিয়ে বনে এলেন। প্রান্তরের মাঝে রথ থামিয়ে দিল। সীতাজী জিজ্ঞেস করলেন, সেনাপতি! এখানে কোনো তীর্থযাত্রা নেই। এখানে রথ থামল কেন? সেনাপতির চোখ থেকে অবিরাম অশ্রু ঝরছে। ব্যথিত কণ্ঠে সীতাজীকে সমস্ত কথা বলিলেন। নিবিড় জনমানবহীন বন। চারিদিকে হিংস্র বন্য পশুর গর্জন, বিষাক্ত হিংস্র সাপের কোলাহল। একটা রাতও কি নিরাপদ হবে নাকি? এটা একটি কঠিন প্রশ্ন ছিল। এত ভয়ংকর জায়গায় সীতাকে গর্ভাবস্থায় ছেড়ে দিতে? কে কাকে আশ্বস্ত করতে পারে? সেনাপতির কাছে সীতাজী নাকি সীতাজীকে সেনাপতি?

দেখুন স্বভুল দর্শনের অলৌকিক ঘটনা! সীতাজী কাঁদতে কাঁদতে সেনাপতিকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন সুস্থ থাকতে। ভাই, কান্না কেন? এতে তোমার কী দোষ? তুমি প্রভুর দাস। তাদের হুকুম পালন করা আপনারও কর্তব্য এবং আমারও, তাদেরও কী দোষ? যে প্রজাদের উপর তাদের শাসন করতে হবে তাদের সন্তুষ্টি প্রদান করা তাদের কর্তব্য, যা তারা পালন করছে এবং প্রজাদেরও কী দোষ? কর্মশক্তিই তাদের এমনটা ভাবতে বাধ্য করে। নইলে এই জনতাই আমাকে জনদম্বা, মহাসতী, সীতামাতা বলে ডেকে আমার নাম জয় করেছিল।

ফিরে এসে সেনাপতি সীতাজীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি স্বামীকে কোনো বার্তা দিতে চান? এ সময়ও সীতাজী বললেন না—তোমার বিচার কী?

শুধু এক পক্ষ শুনে শাস্তি পেলেন? আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না! এমনকী, একজন সাধারণ মানুষও তার স্ত্রীকে ছেড়ে যেতে চাইলে তাকে তার বাপের বাড়িতে পাঠান। তুমি এত বড় রাজা, সেজন্য তুমি আমাকে জঙ্গলে ফেলে চলে গেলে? আপনার ন্যায্যতা জন্য আপনাকে ধন্যবাদ! কোনো কটাক্ষ, কোনো ক্ষোভ নেই। এত স্বাস্থ্য... এত শান্তি... কোথায় পাবেন...? বলুন... আত্মমগ্ন দর্শন থেকে।

যে নিজের ভুল দেখে তার কাছে - এটা আমার ভুল আর এর ফল আমাকেই ভোগ করতে হবে! এই ধরনের চিন্তা শিকারকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তা সহ্য করার জন্য। মানসিক প্রস্তুতি থাকলে একই কষ্ট সহ্য করা সহজ হয়। যদি দূরত্ব বারো কিলোমিটার হয়, বলা হয় এবং প্রকৃতপক্ষে এটি পনেরো কিলোমিটার, তাহলে শেষ তিন কিলোমিটার রচনা করা কঠিন নয়। কিন্তু সঠিক দূরত্ব আগে থেকে জানা থাকলে তা সহজেই ঢেকে যায়। কেন? কারণ অনেক মানসিক প্রস্তুতি আছে। একইভাবে, যে তার ভুল দেখে তার মানসিক প্রস্তুতির কারণে কষ্ট পেতে হয়। এই কারণে, স্বাস্থ্য অটুট থাকে।

অন্যের দোষ দেখে তার ভুলের শাস্তি আমি কেন ভোগ করব? এমন চিন্তায় মানসিকভাবে কষ্ট পেতে প্রস্তুত নন। কষ্ট এড়াতে... কষ্টের প্রতিশোধ নেওয়াই তার মানসিকতা। এবং তবুও, যখন পিড়াতলী যায় না, এই ধরনের কাকতালীয় ঘটনাগুলিতে ব্যথা দেওয়ার ইচ্ছা ব্যর্থ হলে তার অহং আঘাত পায়। সে তার অসহায়ত্ব অনুভব করে। এই সমস্ত কাকতালীয় ঘটনা তার শিকারকে অত্যন্ত অসহায় করে তোলে। তার কাজ পিছিয়ে দিতে চাওয়া জেঠানি যদি একজন গডমাদারের কাজ করতে বাধ্য হয় তবে কতটা অসহনীয় লাগবে? যদি আপনাকে অসহায় ব্যথা সহ্য করতে হয় তবে আপনি অবশ্যই অস্বস্তি এবং বিরক্তি অনুভব করবেন।

যে তার দুঃখের মূলে অন্যের দিকে তাকায়, সেই ব্যক্তিকে 'শত্রু' বলে মনে হবে। শত্রুর কষ্ট সহ্য করতে কে প্রস্তুত থাকবে? তবু সহ্য করতে হয়, তাই নিয়ে মনটা আরও ব্যাকুল হয়ে ওঠে! শত্রুতা—প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবণতা প্রবল থাকে, তাই প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত মন অস্থির থাকে। মন কোথাও শান্তি পায় না।

আমাদের ভুল অতীতের জিনিস, অর্থাৎ যা হয়ে গেছে — এমনই হয়ে গেছে। এখন এতে কোনো পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই তার শাস্তি হিসেবে

যা ভোগ করতে হবে তা কমানো আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। এটা মানসিকভাবে গৃহীত হয়, তাই কষ্ট সহ্য করার মানসিক প্রস্তুতিও আপনাআপনি হয়ে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, তার কষ্টের উৎস অন্য একজন, তখন মনে হয় অন্যের বর্তমান কাজ, অদ্ভুত কথা, অদ্ভুত আচরণ ইত্যাদি বা তা যদি কমে যায়, তাহলে এমন সম্ভাবনা অনুভব করে তার দুঃখও হতে পারে। চলে যান বা হ্রাস পান, তিনি এটি থামাতে বা হ্রাস করতে চান এবং তারপরে তার প্রচেষ্টা শুরু হয়।

এটা করার পরও যখন সেই ব্যক্তি এ ধরনের প্রবণতা বন্ধ করে না এবং ফলে তার দুঃখ-কষ্টের অবসান হয় না, তখন এই অবস্থা অসহনীয় হয়ে ওঠে। লোকটাকে খুব খারাপ মনে হয়। আপনার অহং আঘাত পায়। দুর্ভোগ কমানো, কষ্ট কমানো - এই লক্ষ্য হওয়াতে, কমার পরিবর্তে, কষ্ট যখন আরও বেশি আর্দ্র হতে থাকে, তার সময়কাল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়, তখন তা আরও অসহনীয় হয়ে ওঠে। এসব কারণেও মনটা খুব খারাপ থাকে।

সীতাজী তাঁর নিজের কর্মের দোষ দেখতেন। সে কারণেই তিনি সম্পূর্ণ শান্ত ও সুস্থ ছিলেন। রামচন্দ্রজীর বিরুদ্ধে রাগও নয়, অভিযোগও নয়। (আত্মকর্মের দোষ দেখে তাৎক্ষণিক লাভ কি কম যে সেই উপকার হারিয়ে অন্যের দোষ দেখে আমরা মূর্খ হব?) সীতাজী রামচন্দ্রজীকে খুব মহৎ বার্তা পাঠান - স্বামীনাথ! লোকে শোনার পর আমাকে বলি দিচ্ছেন, তাতে কিছু যায় আসে না। আপনি আমার কাছ থেকে সওয়াই সীতা পাবেন এবং এটি আপনার মুক্তি বন্ধ করবে না। কিন্তু এই পৃথিবী। আপনি যদি কখনও জৈনধর্মের সমালোচনা করেন তবে এটি ছেড়ে দেবেন না, কারণ আপনি যদি এর সমতুল্য কোনও ধর্ম না পান তবে আপনি তার সমতুল্য কোনও ধর্ম পাবেন না এবং এটিকে বলিদান অবশ্যই আপনার মুক্তিকে বন্ধ করে দেবে। কী আশ্চর্য ব্যাপার...! কোনো অভিযোগ নেই, কোনো বিদ্রুপ নেই, কোনো রাগান্বিত শব্দও নেই।

আমাদেরও কি এমন মানসিক অবস্থা চাওয়া উচিত নয়?

আমেদাবাদের শাহপুরের চুনারা খাঞ্চায় মঙ্গীবেন নামে এক মহিলা থাকতেন। গুরুদেব শ্রী সিদ্ধিউরিশ্বরজী এম. এস. (বাপজি এম.এস.)-এর প্রতি তাঁর অদম্য ভক্তি। পূজা করেই যে কোনো কিছু খাওয়াই ছিল তার নিয়ম। এমনকী, যদি গুরুদেব বর্ষিতপ কাবিয়াসন করতে বসেন, তিনি পর্দার আড়াল

থেকে তাঁর হাতটি বের করতেন এবং মঙ্গীবেন সেই হাতটিকে প্রণাম করতেন। কর্মের দ্বারা, তিনি একজন ধর্মপ্রাণ যুবকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি বোরিভালিতে থাকতে শুরু করেন। স্বামীর মনে ধর্মের প্রতি প্রবল বিরক্তি। এ কারণে মঙ্গীবেন প্রভুদর্শন-সময়ক-স্ব-অধ্যয়ন কোনো কিছু করলে স্বামী খুব রেগে যেতেন। অনেক সময় তাই স্বামীর অবর্তমানে সব করতেন। ছয় : কর্মগ্রন্থের চর্চা করেছিলেন, কামপয়দিতক। তিনি অন্যদেরও শিখিয়েছিলেন। একদিন কামপায়দির কপি পড়ছিলেন। হঠাৎ পাড়া প্রতিবেশীরা এসে বলল, আন্টি! চাচা এসেছেন... চাচা এসেছেন...। স্বামী যে এ সময় আসবেন তা তার ধারণা ছিল না। চারশ পৃষ্ঠার একটি কপি দ্রুত একটি বইয়ের আলমারিতে বেঁধে উপরের আলমারিতে রাখা হয়েছিল, কিন্তু স্বামী তা দেখেছিলেন। তাঁর ক্ষোভ জ্বলে উঠল। ঘরের দরজায় তালা... ''আমি যখন কাজে যাই, তুমি কি এই ব্যবসা করো?'' বউকে মারতে শুরু করল... রাগ... অনুচিত কথার তার... ধর্মের বিরুদ্ধে ক্ষোভের শিখা। হত্যাকাণ্ড চলছিল। দরজায় বাইরে থেকে মারামারি শুরু হলো - দরজা খোলো নাহলে ভেঙে দেব। তারপরও সে দরজা খুলল না। মঙ্গীবেন অরিহন্তের নাম উচ্চারণ করছিলেন... গুরুদেবকে স্মরণ করছিলেন। এমনকী তাঁর স্বামীর পাপাচারও তাঁকে দেখতে হয়নি। আমার কাজগুলো মন্দ... আর এই কারণে কোনো অভিযোগ নেই, কোনো ক্ষোভ নেই, কোনো ইচ্ছা নেই। আবার স্বামীর মনের রাগ, আবার মারধর... স্বামীর এই রাগ চলে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে। অবশেষে সে তার কাজে চলে গেল। কিন্তু যেতে যেতে বইটা জলের ট্যাঙ্কে ফেলে দিল। সব প্রতিবেশীরা বাড়িতে এসে পড়ল। তবে মঙ্গীবেন তখনও শান্ত এবং সুস্থ। যেন হালকাভাবে দুই থেকে চারটি চাপড় পড়েছে। জলের ট্যাঙ্কে দেখলেন। পুঁথির মলাটও ভেজেনি। এর আগেই মহীবেন স্বামীর হাতে বেশ কয়েকবার মার খেয়েছেন। বৃদ্ধ বয়সে যখন তাঁর স্বামী ক্যান্সারে আক্রান্ত হন, তখন তিনি তাঁর স্বামীর সেবা করেন নিষ্ঠার সঙ্গে। একদিন স্বামী বললেন, আমি তোমাকে বউ, মা বলে ডাকব, দেবী ভগবতী কোথায় ডাকব? আমি তোমাকে দুঃখ দিতে কোনো কসরত রাখিনি এবং তুমি তোমার মুখ থেকে অভিযোগের একটি শব্দও বের করোনি, বরং আমাকে সুখ দিয়েছ। এখন মৃত্যু যখন কড়া নাড়ছে, আমি কী করব তোমার সুখের জন্য?

তুমি যদি সত্যিই আমাকে খুশি করতে চাও, তাহলে আমাদের চালির চতুর্থ ঘরে বসবাসকারী ভাইয়ের সঙ্গে তোমার কিছু ঝগড়া হয়েছিল, তাকে গিয়ে ক্ষমা করে দিও।

এই মঙ্গীবেন কি স্বয়ং তার সত্যিকারের উদাহরণ নয় যে একজন ব্যক্তি যে নিজের ত্রুটিগুলি দেখেন যে কীভাবে শান্ত এবং সুস্থ থাকতে পারে এবং সময় এলে, যে ব্যক্তি ব্যথা দেয় তার জন্য কী উপকারী জিনিসটি তিনি সহানুভূতিশীল হৃদয়ে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? আর যে নিজের কর্ম দোষ দেখে তার কাছে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এর কারণও পরিষ্কার। এই ধরনের ব্যক্তি অন্যের সঙ্গে একটি প্রেমময় বা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে, অনুকূল আচরণকে অনুকূল হিসাবে গ্রহণ করে এবং প্রতিকূল আচরণকে শুধুমাত্র নিজের কর্মের ফল হিসাবে বিবেচনা করে, যাতে মনের কোণে শত্রুতা জন্ম না নেয়। এই কারণে তিনি সর্বত্র শুধু বন্ধু দেখেন, কোথাও কোনো শত্রু নেই। তাহলে দুশ্চিন্তা, ভয় ইত্যাদি তাকে নিয়ে মনের ভেতর আচ্ছন্ন হবে কী করে? চারপাশের সব বন্ধুই বন্ধু, কোনো শত্রু নেই! এই ধারণা কী চমৎকার! যারা অন্যের অদ্ভুত আচরণে শত্রুতা দেখে তারা খুব বিচলিত থাকে এবং যারা নিজের কাজের দোষ দেখে তারা সম্পূর্ণ সুস্থ ও শান্ত থাকে।

কয়েক বছর আগে, আগ্রার একটি পরিবারে, এমন ঘটনা ঘটে। একজন বিধবা মা তাঁর দুই ছেলেকে ভালো শিক্ষা দেওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম ও কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন। দুজনেই ব্যাঙ্কে ভালো চাকরি পেয়েছে। দুজনেরই ভালো আয় ছিল। জীবিকা নিয়ে আর চিন্তা ছিল না। এখন বিধবা মায়ের মনে একটাই ইচ্ছা ছিল — দুই ছেলের বিয়ে হোক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে। দুজনে বালো যৌতুক নিয়ে এলে জীবনটা সুখে কাটবে। দুই পুত্রই ছিলেন গুণী, নম্র। তিনি জীবনে বেশ স্থিতিশীল ছিলেন এবং চরিত্রবানও ছিলেন। এ কারণে মায়ের ইচ্ছা পূরণে কোনো অসুবিধা হয়নি। তার কল্পনা অনুসারে, মা বড় ছেলেকে সুখী পরিবারের একটি মেয়ের সাথে বাগদান করেছিলেন। যৌতুকে এক লাখ টাকাও নির্ধারণ করা হয়েছিল।

মা কঠিন জীবনযাপন করেছিলেন। হাতে চার-পাঁচ হাজার টাকাও দেখেননি। আর এখন 'হাতে এক লাখ টাকা আসবে' কল্পনাটা এতই সুখকর ছিল যে মা বারবার সোনালি স্বপ্নে হারিয়ে যেতেন।

স্বয়ং পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রী ভুবনভানুসুরীশ্বরজী মহারাজ জগৎকে ''ধারেলুং ন থায় অনে ন ধারেলুং ঘণুং ঘণুং থায় এনুং নাম সংসার' বলে বর্ণনা করতেন! যদি মানুষের ধারণা অনুযায়ী না হয় এবং যে তার স্বপ্নেও কল্পনা করেনি, এমন অনেক কিছু ঘটতে পারে, তার নাম পৃথিবী। এই কথাগুলো এই পরিবারের কাছে সম্পূর্ণ অর্থবহ ছিল। বিয়ের আগেই আয়কর কর্মকর্তারা মেয়ের বাবার বাড়িতে হানা দেয়, ব্যবসায় অনেক ক্ষতি হয় এবং সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হয়। নির্ধারিত সময়ে বিয়ে করলেও যৌতুক দিতে পারেননি। মায়ের সব স্বপ্ন ভেঙে যায়। সব প্রত্যাশা অপূর্ণই থেকে গেল।

আর কিছু করতে পারল না। নবদম্পতি ঘরে প্রবেশ করলেও মায়ের হৃদয়ে সে স্থান পায়নি। মায়ের অন্তরে পুত্রবধূর প্রতি অপছন্দ-অপছন্দের মিশ্র অনুভূতি ছিল। যাইহোক, পুত্রবধূ খুব সংস্কৃতিমনা, শান্ত এবং সদাচারী ছিল। শাশুড়ির প্রতি তার শুধুই ভালোবাসা ছিল, সে মেয়ের মতোই শাশুড়ির সেবা করত। সে কাজেও দক্ষ ও উৎসাহী ছিল। যে কোনো মানুষের মন জয় করার মতো যথেষ্ট গুণ ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শাশুড়ির মন জয় করতে পারেনি, কারণ শাশুড়ি তার সংস্কৃতি দেখেনি। তার সামনে ছিল ভালো যৌতুকের প্রত্যাশা আর ভগ্ন আশার তিক্ততা। তাই জ্ঞানীরা বলেন—কারও কাছে কিছু আশা কোরো না। তার কারণ এই যে, যদি একটি ছোট প্রত্যাশাও পূরণ না হয়, তবে আপনি আরও অনেক কিছুর মঙ্গল দেখতে পাবেন না, যার কারণে আপনি সেই ভালোর আনন্দ এবং সেই প্রতি ভালবাসার অঙ্কুরগুলি অনুভব করতে পারবেন না। মানুষ আপনার মনে অঙ্কুরিত করতে সক্ষম হবে না।

কিছুদিন পর ছোট ভাইয়েরও বিয়ে হয়। তার স্ত্রী যৌতুকের দেড় লাখ টাকা নিয়ে আসে। মায়ের ইচ্ছা পূরণ হল। ছোট বউ শাশুড়ির লাডলি হয়ে গেল। ফলাফল? মায়ের আচরণ পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে ওঠে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গৃহবধূর কাজ বড় পুত্রবধূর দায়িত্বে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে শুলে শাশুড়ির চিৎকার, ''আরে! আপনি কি ঘুমাতে গেছেন? এই পাত্র কে পরিষ্কার করবে?'' যদি তার বন্ধুরা তার সাথে দেখা করতে আসে তবে পাঁচ মিনিটও লাগত না এবং বড় বোনকে সবার সামনে অপমানিত করা হত—এখন বন্ধুদের বিদায় করুন। তাদের কাজ না থাকলে তারা বের হয়ে যায়। পরচর্চা করতে থাকলে সন্ধ্যার খাবার বানাবে কে?

আর ছোট ছেলের বউ তো দেড় লাখ টাকা এনেছিল, তাই না? শাশুড়ি তাকে রানি বানিয়ে রাখেন। যদি চার জনের মধ্যে যে কাজগুলি এমন সম্মান পায় সেগুলি ছোট পুত্রবধূর দ্বারা করা হত। কারও বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ থাকলে শুধু ছোট ছেলে ও তার স্ত্রী যেত। ছোট বউয়ের মামা এলে তাকে সুন্দর অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তা দেওয়া হতো। বড় মেয়ের শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়রা এলে যেন অবাঞ্ছিত মানুষ এসেছে! গোটা বিশ্ব বুঝতে পারত স্পষ্টতই পক্ষপাতদুষ্ট, এমন পরিবেশ ওই বাড়ির বাড়ির হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বড় পুত্রবধূ সংস্কৃতিমনা ছিল, শুধু কর্ম বিজ্ঞানের নীতি বোঝেনি, বিবেক-বুদ্ধিতে নিয়ে জীবনযাপন করত। খারাপ বা ভালো যাই হোক না কেন, সব কিছুর পেছনেই কারণ ছিল। শাশুড়ির মাথায় কখনও কোনো দোষ চাপাত না। তাই শাশুড়ির প্রতি ভক্তি ছিল। শাশুড়ি যে ধরনের কাজই করুক না কেন, তার মনে কোনো দুঃখের অনুভূতি ছিল না।

'মন সাধ্যুং এণে সাঘলু সাধ্যুং'

(যে মনকে বশীভূত করেছে, সে সবই পেয়েছে।) আনন্দঘনজী এই উক্তি খাঁটি সোনার মতো সত্য বলে মনে হয়, তাই না?

বড় পুত্রবধূর পাশাপাশি এখন বড় ছেলেও অবহেলিত। দুই ছেলের মধ্যেও এখন পক্ষপাতমূলক আচরণ শুরু করেছেন মা। বড় ছেলে এটি বুঝতে শুরু করেছিল এবং সে কর্মের বিজ্ঞানকে আত্মসাৎ করেনি। এই পক্ষপাতিত্ব সে কীভাবে সইবে? একটা অস্থিরতা ও শত্রুতা তার মনে ঢুকে গেল। ফলে মায়ের প্রতি যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল তা এখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। যদি সে তার স্ত্রীর প্রতি অবিচার করায় বিরক্ত হয় তবে সে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করবে। ছেলে যখন তার মায়ের দোষ বলল, তখন সে তার নিজের দোষ খুঁজে বের করবে, তখন তাদের দুজনের মধ্যে এমন আলোচনা হবে...

ছেলে : তুমি মায়ের প্রতিটা কথা মেনে চলো, তোমার কি দোষ? স্ত্রী : আমার কাজের দোষ...!

ছেলে : এটা কেমন কথা?

স্ত্রী : আমার কাজ যদি ভালো হতো, বাবা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এক লাখ টাকা দিতে পারতেন, তাহলে আমি মায়ের ভালো করতাম।

ছেলে : ঠিক আছে কিন্তু মা আমার উপরও অবিচার করে। কী আমার দোষ?

স্ত্রী : তোমারও কর্মফলের দোষ আছে।

ছেলে : আমার কাজের দোষ কী?

স্ত্রী : যদি কর্মের দোষ না থাকত, তবে যে বউ তোমার জন্য এক লাখ টাকা যৌতুক এনেছিল, তাকে কি পেত না?

কিন্তু স্ত্রী কথা মন থেকে মানতে না পারলেও মন থেকে সরাতে পারেননি স্বামী। এ কারণে তার ভাগ্যে ছিল শুধু ঝামেলা আর অশান্তি। এমন অবস্থায় একদিন কোথা থেকে মিষ্টি এল। ভাল মিষ্টি মা ছোট ছেলে ও পুত্রবধূকে এবং সাধারণ-সাধারণ মিষ্টি বড় পুত্রবধূকে দিলেন। বড় ছেলে পক্ষপাতিত্ব সহ্য করতে পারেনি। সে চিৎকার করে বলল, মা, আমি অনেক দিন ধরে আপনার এমন পক্ষপাতিত্ব দেখছি। আপনি যদি এটি করতে থাকেন তবে তো আমরা ভেঙে পড়ব। একথা শুনে বড় বউ বলল—আহা! এসব কী বলছ? যে মা তোমায় নয় মাস গর্ভে রেখেছেন, লালন-পালন করেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন—সুশিক্ষা ও মূল্যবোধ দিয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছেদের কথা কীভাবে বলতে পার? এমন ভাববেও না।

স্ত্রীর এমন কথা শুনে ভাবনায় পড়ে স্বামী। আসলে, মজুরের মতো পরিশ্রম করেও তার স্ত্রীর প্রশংসার দুটি শব্দ পাননি, তাকে উপর থেকে মায়ের ক্রোধ সহ্য করতে হয়েছিল, ছোট পুত্রবধূ রানির মতো জীবনযাপন করেছিল, তারপরও মা করেছিলেন। তার প্রশংসা না, সে ক্লান্ত ছিল এত কিছু বারবার ঘটলেও স্ত্রীর স্বাস্থ্য, কাজের প্রতি নিষ্ঠা আর মায়ের প্রতি নিষ্ঠা... সব কিছু আগের মতো দেখে স্বামী অনেকবার জিজ্ঞেস করত—এসব সহ্য করছ কেন?

আমার জন্য সবকিছুই সহজ কারণ আমি সেই অনুযায়ী নিজেকে তৈরি করেছি।

তাই অন্যের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ হতে হবে? মায়ের বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত নয়?

মা মা-ই হয়। তাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত, তাই না?

এটা বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চোখকে চশমার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয় না, চশমাকে চোখের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। কারণ হলো (১) চোখ আগে থেকেই আছে, চশমা পরে আসে। (২) চোখের জন্য পছন্দ করা হয় না, চশমার জন্য পছন্দ করা হয়। একইভাবে (১) জীবনে মায়ের অস্তিত্ব আগে থেকেই

আছে, স্ত্রীর প্রবেশ পরে। (২) পছন্দ মায়ের দ্বারা করা হয় না, পছন্দ করা হয় স্ত্রীর জন্য। আর সেজন্যই স্ত্রীর পছন্দ হওয়া উচিত মায়ের সঙ্গে মিল রেখে। অর্থাৎ স্ত্রীকে মায়ের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ হতে হবে, মাকে স্ত্রীর প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ হতে হবে। বাস্তবে...

স্ত্রী সুস্থ, কারণ তিনি মায়ের ভুল দেখেন না এবং এই সোনালি সূত্রটি গ্রহণ করেছেন ''আমাকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে হবে''। স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ে, হইচই করে আর তাই মায়ের দোষ দেখছে বলেই সে বিচ্ছেদের কথা বলছে। জ্ঞানীরা বলেন নবভাবেন কায়া শ্লেষ, কিরিয়া তব্বভ বুদ্ধি ধরি ক্রিয়া, যে ক্রিয়া দ্বারা কর্ম করা হয়, সেই অনুভূতির বৃদ্ধি হয়। ছোট ছেলের প্রতি বারবার পক্ষপাতিত্বের কারণে মায়ের মনেও বড় ছেলের প্রতি ঘৃণা ও অপছন্দের অনুভূতি জেগেছিল। তাই বড় ছেলের বিচ্ছেদের কথা মেনে নেন মা। বড় পুত্রবধূর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ি ভাগ হয়ে যায় এবং মা ছোট পুত্রবধূকে নিয়ে থাকতে শুরু করেন।

প্রথম দিনই রাতের খাবার খেয়ে ছোট পুত্রবধূকে ঘুমিয়ে পড়ে। মা বললেন, মেয়ে, আগে বাসনপত্র পরিষ্কার করো, তারপর ঘুমাও।

উত্তর পেলেন, মা আমি এসব করব না। আমি ঘুমাতে যাচ্ছি...

আজ পর্যন্ত বড় বউই এসব করত, আজ মাকে করতে হলো। ছোটবউ বিকেল চারটার সময় উঠে, রেডি হয়ে বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

কোথায় যাচ্ছিস মেয়ে?

বন্ধুদের বাড়ি।

কিন্তু সন্ধ্যার রান্নাবান্না?

''দেখুন, আমি এক বন্ধুর বাড়িতে ডিনার করতে যাচ্ছি। সে পার্টি দিচ্ছে।''

''এবং আমি কী করব?''

''খাখরা তো আছে, তা বানিয়ে খেয়ে নেবেন।''

পরদিন সকালে শাশুড়ি পুত্রবধূকে বললেন, ''জামাকাপড় ধুয়ে দাও...''

''দেখুন মা, আমি এমন কাজে অভ্যস্ত নই, চাকর না রাখলে কী হবে?''

''আমাদের আয় কী ধরনের আছে? এত টাকা আর এত খরচ...? বাড়ি কেমন করে চলছে?''

"কিন্তু মা, আমি যে দুই লাখ টাকা এনেছি, তার মধ্যে আমি এভাবেই খরচ করতে থাকব।"

ভক্তির প্রতি, সংসারের প্রতি বা কাজের প্রতি ছোট পুত্রবধূর মনে বিশেষ আগ্রহ ছিল না। শ্রীমন্ত পরিবারে যেভাবে থাকতেন, এখানেও থাকতে চেয়েছিলেন।

মা চিন্তা করতে লাগলেন। এভাবে দেড় লাখ টাকা শেষ করতে কত সময় লাগবে? দুশ্চিন্তায় অসুস্থ হতে শুরু করে। ছেলে মায়ের চিকিৎসা করাচ্ছে কিন্তু পুত্রবধূ বুঝতে পারছে না যে শুধু ওষুধ দিয়ে রোগ সারানো যায় না। মাঝে মাঝে মা বলতেন—বউমা! চারবার ওষুধ খেতে হয়। সময় হলে দিয়ে দিও।

উত্তর পেলাম - মা! আমি টেবিলে ওষুধ রেখেছি। সময়মত নিয়ে নেবেন।

ওষুধ খাওয়ার সময় হয়ে গেল। মা ডাকলেন মেয়ে! জল দাও ওষুধ খাব।

"এই, আমি আপনার কাছে কলসি রেখে দেব। আমাকে বার বার ডাকবেন না।" ছোটবউ সেবার পাঠও শেখেনি। সে আত্মকেন্দ্রিক ছিল। সে নিজের মধ্যে হারিয়ে থাকে।

আজ পর্যন্ত মা তাঁর অসুস্থতার কথা বড় ছেলে ও পুত্রবধূকে জানাননি। কিন্তু পুত্রবধূ কোথাও থেকে খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে শাশুড়ির কাছে ছুটে আসে। শাশুড়ির সেবায় কাটাত। ধীরে ধীরে মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে থাকে। একদিন মা উঠে দাঁড়ান। অশ্রুসজল চোখে পুত্রবধূর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন। পুত্রবধূ কিছুই বুঝতে পারল না। কথা বলো মা! তুমি এ কী করছ? আর তোমার চোখে এই কান্না কেন মা?

কন্যা! আমি তোমাকে চিনতে পারিনি, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। অনেক কটু কথা তোমাকে বলেছি। কোথায় তোমার বড় মন আর কোথায় আমার তুচ্ছতা! আমাকে মাফ করে দাও মেয়ে!

কীসের আফসোস মা? আমার কর্মই আমাকে কষ্ট দিয়েছে, তুমি নও, তাহলে ক্ষমার প্রশ্ন কোথায়?

আসলে বড় বউ শাশুড়ির কোনো দোষ দেখেনি। আর এ কারণে শাশুড়ির জন্য তার মনের কোণে কোনো রাগ বা বিরক্তি ছিল না।

মা বললেন, কন্যা, আমার একটি প্রার্থনা আছে, মানবে?

খুব খুশি গলায় বলল, মা! আপনাকে প্রার্থনা করতে হবে না, আপনাকে আদেশ করতে হবে। আমরা আপনার সন্তান, আপনার আদেশ পালন করা আমাদের কর্তব্য। তুমি বলো।

মা বললেন, কন্যা! এই বিভাজন মুছে ফেলা হোক, এটাই আমার ইচ্ছা। পুত্রবধূ বলল, তাড়াতাড়ি চলো... মা। এখনই চলো ভালো কাজে দেরি কেন?

যে ব্যক্তি নিজের কর্মের দোষ দেখে, এই পৃথিবীতে শান্ত ও সুস্থ থাকে, সে কী আনন্দদায়ক ফল পায়! আর পরকালে? আমরা এখন নানকের দৃষ্টান্তটি দেখব যে প্রকৃতি তাকে পরকালে একটি মহান পুরস্কার দেয়।

৯. পরকালে মহান পুরস্কার...

পর্যুষণ মহাপর্বের দিনে, পরম পবিত্র শ্রী কল্পসূত্রের বক্তৃতা পাঠ করা হয় এবং শোনা হয়। এতে সাপের দৃষ্টান্ত এসেছে। পূর্বজন্মে নাগকেতু বছর পনেরোর এক কিশোর ছিল। তার মা মারা গিয়েছিল। সৎ মা ছিলেন। এমনকী, সৎ মায়ের প্রতি সে বাধ্য, নম্র ছিল। মা যখনই কোনো কাজ করতে বলতেন, সে যে খেলাই খেলুক না কেন, সে কাজটি করে দিত এবং আনন্দের সঙ্গে করত। কিন্তু নাগকেতুর প্রতি মায়ের মনে অনেক ঘৃণা ছিল। সে বিষয়টি নিয়ে তাকে বকাঝকা করত, তাকে চড় মারত এবং মাঝে মাঝে খুব নির্দয়ভাবে তাকে ফিরিয়ে দিত, তাকে ক্ষুধার্ত রাখত... তাকে ঘরে আটকে রাখত। দিনে দিনে সৎ মায়ের অত্যাচার বাড়তে থাকে। কিশোর নাগকেতু হয়ে উঠল বিষণ্ণ, বিষণ্ণ। অবশেষে বন্ধুর পরামর্শ নিতে গেল। তার জন্য ভাগ্যক্রমে, সেই বন্ধুটি ছিল শ্রাবক। যে কথাগুলো সে শুধু শোনেনি, সেসব শব্দের মর্মও সে বুঝেছিলেন এবং জীবনে আত্মসাৎও করেছিল। এ কারণে তার দৃষ্টি সংকীর্ণ ছিল না। তার দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা করার ক্ষমতা ছিল, তাই সে বর্তমানের দিকে না তাকিয়ে দীর্ঘ ভবিষ্যতের কথা ভাবত। বর্তমানের দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলা করার পদ্ধতি সে গ্রহণ করেনি যা ভবিষ্যতে আরও ভয়াবহ দুঃখকে আমন্ত্রণ জানাবে। সে বিশ্বাস করতেন এমনভাবে জীবন কাটাতে যাতে বর্তমানের দুঃখ নেই, ভবিষ্যতেও কোনো দুঃখ থাকবে না, শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতেও প্রকৃতি যেন বড় বড় পুরস্কার দেয়।

সভা : বর্তমান দুঃখ প্রতিহত করা কি সম্ভব?

সাধু : অবশ্যই সম্ভব। সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। একই প্রতিক্রিয়া জানালেন এই কল্যাণমিত্রও। আর সেই কিশোরকে করে তুলেছেন দ্বিতীয় সংসারে অনন্ত সুখের ভোগী। সে যেন নিজের সামনে দুটি বিকল্প রেখেছিল : এই কিশোর তার মায়ের কারণে খুব দুঃখিত, কারণ (১) এই কিশোরের কর দুষ্ট। (২) এই কিশোরের সৎ মা দুষ্ট। কল্যাণমিত্র ভালো করেও বোঝেন যে,

এই কিশোরকে যদি প্রকৃতির হাতে পুরস্কৃত করতে হয়, তাহলে প্রথম বিকল্পটি তার মনে দৃঢ়ভাবে স্থির করা উচিত। যদিও কিশোরের মানসিকতা দৃঢ়ভাবে শুধুমাত্র দ্বিতীয় বিকল্পটি গ্রহণ করে।

সাধারণত, সমস্ত বিশ্ব তাদের সমস্যার জন্য অন্য কোনো প্রাণীকে দায়ী করে এবং এটিকে মন্দ বলে মনে করে। প্রতিবারই এই উত্তর ভুল, যার ফলস্বরূপ জীবগুলি প্রায়শই প্রকৃতির কাছ থেকে কঠিন শাস্তি পায়। গোলমালের মেজাজও একইরকম ছিল, তাই আপার মায়ের প্রতি অনেক অভিযোগ করতেন। তিনি কতটা বাধ্য, বিনয়ী ইত্যাদি বর্ণনা করে বলেন, মা এত কষ্ট দেন। তারপর আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করুন, বন্ধু! এরপর আমার কী করা উচিত?

কিশোরের বন্ধু চাইলে বলতে পারত—তুমি এত বাধ্য, বিনয়ী, তবুও তোমার আপার মা তোমাকে এত কষ্ট দিচ্ছে? তোমার হাতে ক্ষমতা আছে নাকি? কাঠ কুড়ানো এবং এটি ঠিক করতে! একবার বা দুবার দাও যে চিরকালের জন্য নীরব হয়ে যায়! এমন পরামর্শ ছিল যে শোরও এটি পছন্দ করেছিল, কারণ তার মেজাজও শোনা গিয়েছিল যে তার মা সবচেয়ে খারাপ ছিলেন। আর অন্যকে মন্দ মনে করা আত্মার চিরন্তন সংস্কার। তাই তাকে ''বন্ধু, তোমার মা মন্দ নয়, তুমি কর্ম বদমাশ'' বলে তাকে বোঝানোটা উল্টোদিকে সাঁতার কাটার মতো কঠিন ছিল না, তবুও সেই বন্ধুটি কিশোরকে এটা বোঝানোই সঙ্গত মনে করেছিল কারণ আসল গোলমালের কল্যাণ নিহিত তার মধ্যে।

এই কথাগুলো সে কিশোরকে বলল, দোস্ত! মাকে মন্দ মনে কোরো না। তোমার সামনে তোমার কাজগুলো মন্দ। প্রতিশোধ তো দুষ্টদেরই দিতে হবে! যে মন্দ নয় তার জন্যও যদি আমাদের ঘৃণ্য আচরণ করতে হয়, তাহলে সবাই আমাদের প্রতিও ঘৃণ্য আচরণ শুরু করবে।

প্রশ্ন। কিন্তু মা যদি প্রতিশোধ নিতে না হয়, তবে তার দিক থেকে আসা ভোগান্তির শেষ থাকবে না। তাহলে 'বর্তমানে দুঃখ থাকবে না ভবিষ্যতেও দুঃখ থাকবে না' এই প্রতিশোধ গ্রহীতাদের দ্বারাও হবে না, তাই না?

উত্তর। না, এটি সেই ধরনের প্রতিরোধ হওয়া উচিত। অর্থ এই যে, যার কষ্ট আসে, কষ্ট আসে... সহ্য করতে হয়... এই কষ্টগুলো যদি কোনো জীবকে অসুখী করে, তবে তাকেই দুঃখ বলে। যদি তারা দুঃখের কারণ না হয় তবে তাকে দুঃখী বলা হয় না।

সিকান্দার অন্য রাজ্য জয় করে দেশে ফিরছিলেন। পরাজিত রাজার সম্পত্তি প্রভৃতি একত্রে প্রচুর ছিল। একজন শ্রমিককে ওঠার জন্য হীরা ও গহনা ভর্তি একটি ব্যাগ দেওয়া হয়েছিল। তাকে আলেকজান্ডারের সঙ্গে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পথে একটা ছোট পাহাড় এলো। কর্মী ক্লান্ত ছিল, তার শ্বাসকষ্ট ছিল। তার প্রতি মন্ত্রীর মনে সহানুভূতির অনুভূতি জাগে। বললেন, রাজন! প্লিজ বোঝাটা একটু কমিয়ে দাও, তাই না?

সিকান্দার বললেন : মন্ত্রী! আপনি এই কথা বলছেন, তিনি বলেন?

মন্ত্রী : আমি তাকে জিজ্ঞেস করব...

রাজা : হ্যাঁ জিজ্ঞেস করো। তবে আগে ঘোষণা করতে হবে যে, যে মজুর ভার নিয়েছে তাকে রাজা উপহার হিসেবে দেবেন। ঘোষণা দেওয়া হলো, তারপর মন্ত্রী কর্মীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি বস্তার বোঝা কমাতে চান? তিনি স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, শুধু তাই নয়, নম্রতা, অসহায়ত্ব এবং ক্লান্তির অভিব্যক্তি যা তার মুখে এতদিন দেখা গিয়েছিল তা সতেজতা, প্রাণশক্তি এবং উজ্জ্বলতা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। এই ভারী বোঝা কি এখন তার জন্য বেদনাদায়ক হবে?

ওই হিন্দু মহিলা! স্বামী মারা গেলে তিনি সতীদাহ করতে চেয়েছিলেন। ব্রিটিশ চাকর তাকে প্রত্যাখ্যান করছিল। বলছিলেন - এই মহিলা সমাজের চাপে সতীদাহ করতে চান না, স্বেচ্ছায় নয়, তাই অনুমতি দেব না। অমলদারের এই অভিপ্রায় শুনে মহিলা স্পষ্ট বললেন, আমি স্বেচ্ছায় সতীদাহ করছি। অমলদার বললেন, এটা একটা ক্ষণস্থায়ী চার্জ। আগুনের স্পর্শে সব সুখ বাতাস হয়ে যাবে। কিন্তু অধিবেশন দৃঢ় ছিল।

ব্রিটিশ অফিসার বললেন - ''যদি আমি আমার পরীক্ষায় সফল হই, তাহলে অনুমতি দেওয়া হবে।'' তিনি আগুন জ্বালিয়ে মহিলাকে বললেন, 'এই আগুনে তোমার হাত দাও এবং আমি না বলা পর্যন্ত তোমার হাত টানো না।' মহিলাটি জ্বলন্ত আগুনে হাত দিল। আঙুল জ্বলতে লাগল, তালুও পুড়ে গেল, তবুও হাত সরেনি। শুধু তাই নয়, তার মুখে একটা স্বতন্ত্র হাস্যরস ফুটে উঠল। অবশেষে অফিসার অনুমতি দিলেন এবং মহিলাটি একই উদ্ভাসিত হাস্যরসে তৃপ্ত হলেন।

ভগৎ সিংও হাসিমুখে মৃত্যুকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তাই না?

গণতন্ত্র-পরবর্তী সরকারে এরকম অসংখ্য নজির থাকবে। খন্দক ইউরির পাঁচশো শিষ্য আগে তুমি... তুমি আগে না, আমি আগে... আগে আমি! এটা যেমন গুরুত্ব ছিল।

মৃত্যুকে যদি দুঃখজনক মনে হতো, তবে মুখে এই প্রতিযোগিতা বা হাস্যরস সম্ভব নয়। এইভাবে প্রমাণিত হয় যে, যিনি দুঃখী আত্মাকে দুঃখ দেন তাকেই দুঃখের রূপ বলা হয়।

(১) সৎ মাকে দুষ্ট মনে করলে প্রকৃতি আমাকে কঠিন শাস্তি দেবে। তার জায়গায়, কর্মগুলিকে খারাপ হিসাবে বিবেচনা করে, যদি আমি তাদের সমানভাবে সহ্য করি, তবে প্রকৃতি আমাকে একটি মহান পুরস্কার দেবে। এটা স্পষ্ট যে গ্র্যান্ড প্রাইজ কল্পনাকে দুঃখের আকারে থাকতে দেয় না।

(২) যার দুই-তিন কেজিও ওজন তোলার অভ্যাস নেই, পাঁচ কেজি তোলা কঠিন মনে হবে, কিন্তু যে দশ কেজি ওজন তোলার ক্ষমতা অর্জন করেছে তাকে দুঃখী বলে মনে হয় না। তাই একজন সাধক প্রভুর কাছে সুন্দর প্রার্থনা করেছেন—হে প্রভু! আমি চাই না যে আমার বোঝা কম হোক। আমি শুধু জিজ্ঞাসা করি যে সেই ভার বহনকারী আমার পিঠকে শক্তিশালী করে তোলে।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, এভাবে যে তার ভুল দেখে তার সহনশীলতার শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং স্ট্যামিনা বাড়ানোর পর একই ট্র্যাজেডি তার জন্য দুঃখজনক থাকে না।

(৩) এখন সহ্য করতে হবে, এমন কথা মনে দৃঢ় হওয়ার পর এবং বহুবার এমন কষ্ট সহ্য করার পর তা দৈনন্দিন সকল কাজের মতো স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং কোনো দুঃখ দুঃখের আকারে থাকে বলে মনে হয় না। হাত-পা ভাঙার কারণে যে পঙ্গুত্ব বা শারীরিক ত্রুটি দেখা দেয় তা শুরুতে যেমন বেদনাদায়ক ছিল, এখন এই অবস্থা চিরকাল থাকবে, তাতে কোনো উন্নতি সম্ভব নয়, মেনে নেওয়ার পরও থাকে না। সেই অবস্থায় মন অভ্যস্ত হয়ে যায় - ইত্যাদি। যদি কিছু উন্নতি প্রত্যাশিত হয় এবং কোনো উন্নতি না হয়, তাহলে সেই অবস্থা অবশ্যই দুঃখজনক দেখাবে। যে অন্যের ভুল দেখে সে এই সংশোধন আশা করে, কারণ সেই অন্যের বর্তমান আচরণ দুঃখের মূল বলে মনে হয়। যেখানে যে তার ভুল স্বীকার করে সে স্বীকার করে যে ''একটি ভুল হয়েছে, এটি করা হয়েছে... এখন এটি পরিবর্তন করা সম্পূর্ণরূপে

অসম্ভব" তাই তার উন্নতির কোনো ইচ্ছা নেই। আর কোনো প্রত্যাশা নেই, সে কারণেই এ অবস্থা দুঃখজনক নয়। কারণ হলো—"অভিক্ষা আনন্দে" - পরপেক্ষা বড় দুঃখ। প্রভৃতি শাস্ত্র প্রত্যাশাকে শুধু দুঃখ বলে। (বইটি পড়ুন-এর যুক্তিপূর্ণ বোঝার জন্য অভিক্ষা অণাণংদে)

অর্থাৎ, আমাদের জীবনে যা কিছু দুঃখ এসেছে বা আসছে, যদি সেগুলিকে দুঃখিত করার ইচ্ছা থাকে এবং তার কারণে দুঃখিত না হয়, তবে তার সর্বোত্তম প্রতিকার হল স্বদোষদর্শন - নিজের ভুলের দৃষ্টি। যদি ব্যক্তি নিজে দুঃখিত না হয়, তাহলে তার জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার, মানসিক চাপ বা বিচলিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, এটি পরিষ্কার। তাই নিজের দুঃখ বা কষ্টের মধ্যে নিজের দোষ দেখাই মানসিক শান্তির নিশ্চিত প্রতিকার।

এই কিশোরের মনেও আমার মা মন্দ নন, তিনি মন্দ, এমন আদর্শ যদি আমার মধ্যে দৃঢ় হয়ে ওঠে, তবে বোঝা যায় না অতিরিক্ত মায়ের দুঃখ দুঃখের আকারে থাকত না (এই উপলব্ধি ভবিষ্যতে একটি গ্র্যান্ড পুরস্কার হিসাবে প্রমাণিত হবে, আমরা এগিয়ে যাব) দেখা হবে।

প্রশ্ন। কিন্তু এমন মানসিকতা কীভাবে অর্জন করা যায়? অত্যন্ত ভয়ানক কষ্ট সহ্য করতে গিয়ে, এটা আমার নিজের কর্মের দোষ, যদি হ্যাঁ, তাহলে সেই ব্যক্তি মন্দ নয়! এটা মেনে নেওয়ার জন্য মন কীভাবে প্রস্তুত হবে? মন শুধু বলবে—"সেই বখাটে, দুষ্ট, আমাকে কষ্ট দেয়..."

উত্তর। হ্যাঁ, এটা ঠিক। অনাদিকালের সংস্কৃত এই রকম আর তাই যে মন বলে এইরকম মানসিকতা অর্জন করতে হবে, এটা মোটেই কঠিন নয়। তবুও সঠিক উপলব্ধির মাধ্যমে বিবেককে জাগ্রত করে এমন মানসিকতা অর্জন করা যায়। জেলর প্রভৃতি একমাত্র বিবেচনার যোগ্য। কিন্তু সেই বোঝাপড়ার মাধ্যমে এমন মানসিকতা পাওয়া খুবই প্রয়োজন, কারণ বন্ধু বোঝে আগুন লাগলে শুধু জল ছিটাতে হবে, পেট্রোল নয়। তাই তো আমি তার সত্যিকারের বন্ধু!

গুণসেনের অসহ্য ট্র্যাজেডিতে বিপর্যস্ত অগ্নিশর্মা নিজের বাড়ি ও শহর ছেড়ে সব কিছু ছেড়ে পালিয়ে আশ্রমে পৌঁছে যান। উপাচার্যের অনুরোধে তিনি তার সমস্ত অগ্নিপরীক্ষা বর্ণনা করেন। যদিও উপাচার্য জৈন শাসন পাননি, কিন্তু তাঁর আর্য দেশ ও আর্যসংস্কৃতি ছিল। ওরা বোঝে আগুন লাগলে শুধু জল ছিটিয়ে নাচতে হবে... অন্যরা পছন্দ করুক আর না করুক। যদি আমি

এটা করি তবেই আমি প্রকৃত হিতৈষী। তাই সে জল ছিটাতে লাগল - বৎস! গুণসেনা তোমাকে উপহাস করে কেন?

গুরুজী! তাই তো আমার শরীরটা এত কুৎসিত।

বৎস! অনেকেরই কদর্যতা আছে, কিন্তু আপনার শরীর ও শরীর অদ্ভুত জিনিসে ভরপুর, তাই না?

হ্যাঁ গুরুদেব! জাল কোন অঙ্গ সোজা বা ভাল। আমি যখন আয়নায় দেখি, আমারও খুব খারাপ লাগে।

বৎস! তোমার এই কদর্যতা সৃষ্টিতে কি গুণসেনের হাত আছে?

"গুরুদেব! এর মধ্যে গুণসেনের কী হতে পারে? আমার নিজের কর্মের দোষ...!"

এটা ঠিক বৎস! আপনার অসুন্দরতা এবং আপনার অসহায়ত্বের কারণে গুণসেন আপনাকে উপহাস করে, এবং আপনার কদর্যতা এবং অসহায়ত্বের মূল হল আপনার সামনে আপনার ভুল কাজ... আপনার পাপ কাজ। অর্থাৎ, আপনার বিদ্রুপের মূল হল আপনার অতীতে করা পাপ কাজগুলি... এটিই আপনাকে মনে মনে ভাবতে হবে। যদি এমন পাপ না থাকত, তাহলে এমন কদর্যতা থাকত... আর এই কদর্যতা যদি থাকত, তাহলে তুমি এসবের জন্য উপহাসের পাত্র হতে পারতে না...!

"গুরুদেব! আপনার কথা সঠিক বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু সব কিছু কি আমাদের কর্মের কারণে ঘটে?"

"হ্যাঁ বৎস! তুমি যা বপন করবে তাই পাবে, এই নিয়ম যদি পৃথিবীতে না থাকত, তাহলে পৃথিবীতে কোন জীবই অসুখী হত না, কারণ দুঃখ কেউ চায় না।"

কুলপতির এই বিষয়টি অগ্নিশর্মার মনে এতটাই দৃঢ় ভাবে বসে যায় যে তার নিজের কাজই প্রতিটি সমস্যার কারণ। তখন যা মন্দ বলে মনে হয় তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কর্মফলের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধের একটি মাত্র অস্ত্র - তপস্যা। "আমার কাজগুলি খুব খারাপ, তাই এর বিরুদ্ধে, আমিও খুব তীব্রভাবে তপস্যা করব ... এখন গুণসেনের প্রতি ক্ষোভ নেই, ঘৃণা নেই বা অভিযোগ নেই ... এবং যদি খারাপ অনুভূতি না থাকে তবে মনও অতুলনীয় শান্তির সাগরে ডুবে যায়।"

আসুন একটি কল্পনা করা যাক ... ধরুন কুলপতি অগ্নিশর্মাকে এমন একটি আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত না করতেন বা অগ্নিশর্মা যদি গুরুর কথা মনে না রাখতেন...! গুণসেনের কাছ থেকে চলে যাওয়ার কারণে, গুণসেন তিক্ততা সহ্য করার মতো অবস্থায় থাকত না, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই ট্র্যাজেডির স্মৃতি মনকে বারবার তাড়িত করে, বেদনা ভোগ করতে থাকে। এই ধরনের ভয়ানক মানসিক নির্যাতন নিজেরাই সংশোধন করা হয়েছে এবং তবুও গুণসেনের যন্ত্রণা, কিছু না করার বাধ্যতা এবং উপর থেকে শত্রুর মতো গুণসেনের রাজা হওয়া ইত্যাদি। এই সবই বোঝার মতো - যাকে আমরা চরম অন্যায়, দুষ্ট শত্রু মনে করছি, তাকে আমরা শত্রুতার প্রিজম দিয়ে দেখছি বলে আমরা অনেক দোষে পূর্ণ, মূল্যহীন, অত্যাচারী অনুভব করব। কিন্তু অন্য লোকেরা শত্রুতার চশমা পরা দেখতে পায় না। তাই তারা তাকে অত্যাচারী নয়, একজন গুণী মনে করে এবং তার প্রশংসা করে, তাকে মালা দিয়ে সম্মান করে। এবং যখন আপনি এই অন্যান্য লোকেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন বা এমনকী স্নেহময় ব্যক্তিদের দেখতে পান, তখন এটি আরও বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। কখনও কখনও এমন হয় যে ব্যক্তিটি গুণী নয়, তবুও তার গুণের কারণে সবাই তাকে গুণী মনে করে এবং তার গুণগান গাইতে থাকে। গুণী হওয়ার কারণে তিনি সর্বত্র সফলতা অর্জন করেন, প্রেমের পথে এগিয়ে যেতে থাকেন। আমাদের মনে শত্রুতা বোধের কারণে আমরা যার ব্যর্থতা, প্রতিপত্তি এবং ক্ষতি কামনা করেছিলাম তা আমরা সহ্য করতে পারি না। তাতেও বারবার সাফল্য পেতে থাকলে মনের মধ্যে ভয়ানক ঝড় ওঠে। আমরা যার মন্দ চাই তার জন্য সচেষ্ট, তার সুনাম ও প্রতিপত্তি দেখতে পেলে প্রকৃতির প্রতি অবজ্ঞার অনুভূতিও জাগে। আপনি যদি ভগবানকে কর্তা মনে করেন, তাহলে ভগবানকেও অভিশাপ দেওয়ার ইচ্ছা আছে, এমন উল্কাপাত মনে জেগে ওঠে। এবং কখনও কখনও এটি ব্যক্তি যে কষ্টগুলি পায় তার চেয়ে বেশি বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে।

নিজের কৃতকর্মের দোষ দেখে পরজন্মে যে সুফল পাওয়া যায়, তা পাশে রাখলে এই জন্মে মানসিক কষ্ট থেকে মুক্তি ও অতুলনীয় শান্তিলাভের কম সুবিধা কী?

যে কোনো এক বা একাধিক ব্যক্তির বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার কারণে, যাদের মন উদ্বেলিত ও উত্তেজিত থাকে, তারাই অন্তরের গভীর থেকে করুণা ও আন্তরিক প্রেরণায় পূর্ণ আর্দ্র হৃদয় নিয়ে আত্ম-কর্ম-ত্রুটি দেখার পরীক্ষা করেন। বিবেক। এই বইতে দেওয়া অনেক উদাহরণ এবং যুক্তি দ্বারা -কোনো মানুষ খারাপ নয় - সে আমার দুঃখের কারণ নয়।

দুষ্ট আমার নিজের কর্ম ... নিজেকে, আপনার মনকে এটি ব্যাখ্যা করার জন্য একটি সৎ এবং পর্যাপ্ত প্রচেষ্টা করুন ... একটি অসাধারণ মানসিক অলৌকিক ঘটনা ঘটবে ... অবশ্যই এটি ঘটবে। যে শান্তি অনেক দামি ওষুধ থেকে পাওয়া বিরল, সেই শান্তি পাওয়া যাবে কোনো ওষুধ ছাড়াই।

সেই শ্রাবক বন্ধুটিও এটা খুব ভালো করেই বোঝে এবং সেই কারণে সেও সেই কিশোরীর মনে কাজল ছিটাতে শুরু করে যেটি আপার মায়ের কষ্টে ভুগছিল। ''বন্ধু! তোমার কর্মকাণ্ড যদি খারাপ না হতো, তাহলে তোমার মায়ের অকাল মৃত্যু, তোমার বাবার দ্বিতীয় বিয়ে, তোমার মায়ের হৃদয় স্নেহপূর্ণ নয় বরং ঈর্ষান্বিত হওয়া, বাবা তোমার জন্য চিন্তাও করেন না, এমন সব পরিস্থিতি তৈরি হতো... এটা কিছু হবে না?'' এভাবে অনেক কিছু বোঝানোর পর অতিরিক্ত মায়ের মনে যে ঈর্ষার আগুন জ্বলছিল তা নিভিয়ে দিলেন। এই সব কষ্ট কি আমার নিজের অতীত কর্মের ফল? এই কথা সেই কিশোরের মনে দৃঢ় হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সৎ মা সম্বন্ধে সমস্ত অভিযোগ তাহার মন হইতে মুছে গেল। এবং এখন সেও তার অতীত কর্মের প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

শ্রাবক বন্ধুও একই প্রতিকার বলেছিল... ''তাপস। অতীতের কর্মফল বিনষ্ট করতে, আধ মাকা তপস্যা করুন।'' কিশোর শ্রাবক মিত্রের মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করেন, পর্যুষণ মহাপর্বের সময় আটটি মাকা তপ করার সংকল্প করেন। আমার আগের অপরাধের শাস্তি কী? এই দৃষ্টি অর্জিত হয়েছে, তাই শাস্তি মেনে নেওয়ার মানসিকতা আছে। তাই আপার মাকে নিয়ে এখন আর কোনো অভিযোগ বা অসন্তোষ নেই। মন এখন শান্ত-প্রশান্ত-উপ-শান্ত হয়েছে।

একদিন ঘাসের কুঁড়েঘরের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। মা তাকে দেখেছেন। এই ছেলের প্রতি তার মনেও একই রকম বিদ্বেষ আছে। তাই এ অবস্থাকে উত্তম সুযোগ মনে করে তিনি মনে মনে কুঁড়েঘরে আগুন ধরিয়ে দেন।

ঝুপড়ির সাথে কিশোরটিও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু আমার মনে একটাই রথ - পর্যুষন অথ আমি ... পর্যুষন অথথ আমার .... এবং এখন দেখো - আমার মা মন্দ নন ... আমার কর্ম মন্দ এই সঠিক উত্তরের জন্য প্রকৃতি প্রদত্ত মহান পুরস্কার...

চন্দ্রকান্ত নামে এক নগর ছিল, যার রাজা ছিলেন বিজয়সেন এবং নগরশ্রেষ্ঠী ছিলেন পরম শ্রীমন্ত শ্রীকান্ত। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল শ্রীসখী। বিবাহিত জীবনের বহু বছর অতিবাহিত হলেও কোনো সন্তানের জন্ম হয়নি। অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কিন্তু আকাঙ্ক্ষা ও অপেক্ষার অবসান ঘটেনি। পরবর্তীকালে এই নগরশ্রেষ্ঠীর ঘরেই পুত্রসন্তানের জন্ম হয় শোর। নাম দিয়েছেন নাগকেতু।

অতীতে, একটি কুঁড়েঘরে বসবাসকারী দরিদ্র একজন নাগকে পরিণত হয়েছিল, যিনি একটি খুব ধনী পরিবারে একটি প্রাসাদের মতো ভবনে খেলতেন। পূর্বজন্মে মমতাময়ী মায়ের বিচ্ছেদ এবং সৎ মায়ের দেওয়া যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন, পিতার স্নেহও তাঁর কাছে বিরল ছিল। (বাবা যদি সদয় হতেন, তাহলে সৎ মাতাও এত কষ্ট করতে পারতেন না।) এই জন্মে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর একটি পুত্র লাভ হয়। যার দরুন তিনি পরিবার ও পিতামাতার অগাধ ভালোবাসা পেলেও শেঠের ঘরে ছেলের জন্ম হয় ... শেঠের ঘরে ছেলের জন্ম হয় ... এভাবে তিনি পুরো গ্রামের প্রিয় হয়ে ওঠেন। আর সেটা ছিল মাত্র শুরু। আমরা দেখব প্রকৃতি কীভাবে এর থেকে আরও অনেক বড় পুরস্কার দেয়।

শিশুটির বয়স এখন মাত্র তিন-চার মাস। স্তন্যপান করাই জীবন এবং আসছে পর্যুষণের মহা উৎসব। পরিবারের কয়েকজন জানান, পর্যুষণ আসছে, আমি আশি মাকরুন্না। আবার কেউ বললেন, - আমিও পর্যুষণে আট করব। অন্য কেউ একই শব্দ পুনরাবৃত্তি, বারবার এই কথাগুলো শুনে শিশুটিরও মনে আটখানা হলো, পর্যুষণ! ... শব্দগুলো প্রতিধ্বনিত হতে থাকে... এবং ধীরে ধীরে এই জন্ম ও পূর্বজন্মের মধ্যকার অন্ধকারের স্তরগুলো দূর হয়ে যায়... শিশুটি জাত স্মরণের জ্ঞান পেল... পূর্বজন্মের জ্ঞান। তোমার কৈশোর, মায়ের কষ্ট, শ্রাবক বন্ধুর উপদেশ... আশি মাকার রেজোলিউশন... চোখের সামনে সবকিছু জট পাকিয়ে গেল। তুমি, বুকের দুধ খাওয়া শিশু, সিদ্ধান্ত নিলে — ‘‘এখন তোমাকে পর্যুষাণের জন্যও অপেক্ষা করতে হবে না... আজ থেকে

অষ্টম...!" শিশুটির তপস্যা শুরু হয়। মা শ্রী সখী তার ছেলেকে খাওয়ানোর চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু শিশুটি দুধ পান করে না।

মায়ের দুধ খুব হালকা, সহজে হজম হয়। দুই থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে পেট খালি হয়ে যায়। তিন-চার মাসের বাচ্চা! তার শরীরের ক্ষমতা কত? কিছুক্ষণের মধ্যে সে অজ্ঞান হয়ে গেল - মুঞ্চি তাহো জায়া। স্বজনরা ভেবেছিলেন সে মারা গেছে। তিনি শিশুটিকে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে গর্তে পুঁতে দিলেন। নাগকে তুর বাবা শ্রীকান্ত এতটাই প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন যে তিনিও মারা যান।

সে সময় রাষ্ট্রের নিয়ম ছিল, পিতার পুত্র না থাকলে মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষে দিতে হবে। রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা সম্পত্তি সংগ্রহ করতে আসেন। কিন্তু নাগকে তুমি প্রকৃতির মহান উপহারের অধিকারী ছিলে। প্রকৃতি তাকে নিয়ে চিন্তিত। আর প্রকৃতি কেঁপে উঠলে হেডসে অবস্থিত নাগরাজ ধরনেন্দ্রের সিংহাসন। তিনি কালের জ্ঞান নিয়ে পুরো ঘটনা জানতে পেরেছেন। ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে এলেন। তিনি রাজকীয়দের শ্রেষ্ঠ শ্রীকান্তের সম্পত্তি নিতে বাধা দেন এবং জানান যে শ্রীকান্তের ছেলে বেঁচে আছে। এখন রাজা বিজয়সেন এবং অন্যরা শিশুটিকে কবর দেওয়া স্থানে উপস্থিত হলেন। উপর থেকে মাটি সরিয়ে শিশুটিকে বের করে আনলেন। ব্রাহ্মণ তার উপর অমৃত ছিটিয়ে দিল এবং সে জ্ঞানে এল। ধরনেন্দ্র (ব্রাহ্মণ) রাজাকে বললেন, এই শিশুটিকে খুব যত্ন সহকারে অনুসরণ করুন। তিনি ভবিষ্যতে আপনাকে এবং আপনার শহর রক্ষা করতে যাচ্ছেন। তিনিই পরম দেহ - এই অবস্থায়ই সকল কর্মের বিনাশের পর মোক্ষ লাভ করবেন।

কিছুকাল পরে, রাজা একবার একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে কোচর বলে ভুল করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। মৃত্যুর সময় কিছু সমতা থাকার কারণে সেই মানুষটি দেবতা হয়ে ওঠে। দেব কালের জ্ঞান দিয়ে তার অতীত দেখেছিলেন এবং রাজার প্রতি তীব্র বিদ্বেষ জাগ্রত হয়। তিনি রাজাকে হয়রানি করতে এবং শহরটি ধ্বংস করতে রাজি হন। তিনি শহরের উপর একটি বিশাল পাথর ছুড়ে মারলেন। নাগকে তুমি এটা দেখেছ। কীভাবে গ্র্যান্ড জিন মন্দির ধ্বংস হতে দেওয়া উচিত? সে উঠে এসে তার একটা আঙুল তুলল। প্রচণ্ড পুণ্যের

প্রভাবে এবং অপূর্বের দীপ্ত শক্তির প্রভাবে শিলা থেমে গেল। শহর সুরক্ষিত ছিল।

আর কয়েক বছর কেটে গেল। ভগবানের উপাসনা করার সময় ফুলের মধ্যে একটি ছোট সাপ স্তব্ধ হয়ে গেল। তীব্র যন্ত্রণা... এখনও সাপ, আপনি ভাল ধ্যানে অস্বাভাবিক সমতা নিয়ে এগিয়ে যান। ক্ষপাক শ্রেণি থেকে শুধুমাত্র জ্ঞান প্রাপ্তি। শুভ অনুভূতির প্রভাবে সাপের দংশনের কোনো প্রভাব ছিল না। দীর্ঘকাল কেবলী রূপে বিচরণ করার পর অবশেষে চারটি অমর্যকর কর্মের বিনাশ করে তিনি মোক্ষ লাভ করেন।

আমরা অনেকেই অথ মাতো কেয়া, অথয়ে এবং মাসক্ষামনের মতো তপস্যা করেছি বহুবার, কিন্তু ধরনেন্দ্রের কী হবে, এমনকী, একজন সাধারণ দেবতাও আসেননি... আর ধরনেন্দ্র নিজেই শিশু সাপ হয়ে আপনার কাছে এসেছেন...

নাগকেতুকে রাজা খুব আদর ও স্নেহের সাথে লালনপালন করেছিলেন। বিদ্বেষী দেবতার শক্তিও নাগকেতুর সামনে পরাজিত হয়েছিল এবং তাকে শিলা সংগ্রহ করতে হয়েছিল।

এবং সর্বোচ্চ শিখরের মতো সর্বোত্তম জ্ঞান... বহু জন্মের দীর্ঘ পরিশ্রমের পরও যাঁর প্রাপ্তি অত্যন্ত বিরল, তার জ্ঞান ও মোক্ষ লাভ।

কুদরত সঠিক উত্তরের জন্য যে পুরস্কারগুলি পায় তা দুর্দান্ত...!

আমরাও কি এই ধরনের গ্র্যান্ড প্রাইজ পেতে চাই না?

আমরা প্রকৃতির কাছে বিজাতীয় বা অপ্রীতিকরও নই। তিনি আমাদের এমন অকল্পনীয় মহান পুরস্কার দিতে প্রস্তুত, তিনি কেবল তার দ্বারা নেওয়া পরীক্ষায় আমাদের সঠিক উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছেন...

জীবনে যখন কিছু সহ্য করার সময় আসে, এটি আমার কর্মের দোষ। কষ্টদাতা শুধুমাত্র

জেলর...!

জেলর...!

জেলর...!

(পৃষ্ঠা ৯৬ থেকে শুরু)

এখন আর সারাজীবন বাঁচতে হবে না... অনশন মেনে নিলাম। এবং তারপর...

গুণসেন থেকে সমাদিত্য পর্যন্ত, গুণসেন নতুন মানুষ হয়ে উঠেছেন... পিতা-পুত্র, মা-ছেলে, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-ভাই... এমন সম্পর্কের মধ্যে এসেও, অগ্নিশর্মা প্রতি জন্মে তীব্র বিদ্বেষ নিয়ে বেঁচে থাকেন। গুণসেনকে হত্যা করার চেষ্টা করতে তাকে... গুণসেন সমতার সাথে এগিয়ে যেতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত, সমাদিত্যের গৃহে সমস্ত কর্ম বিনষ্ট করে তিনি মোক্ষ লাভ করেন। অগ্নিশর্মা প্রতিটি নরকে দীর্ঘকাল বিচরণ করবেন এবং ভয়ানক দুঃখ ভোগ করতে থাকবেন।